বিমল রায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প

রচনা

বিমল রায

সম্পাদনা

২৬-এ নগেন্দ্র নাথ রোড, কলি-৭০০০২৮

প্রথম প্রকাশ- ১৪ই এপ্রিল ১৯৬৫

প্রকাশক : কলিকাতা সাহিত্যিকা
২৬-এ নগেন্দ্র নাথ রোড, কলিকাতা-৭০০০২৮

মুদ্রাকর : শ্রীবিজয় চন্দ্র চন্দ্র
৫/২, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, কলিকাতা-৭০০০০৬
এবং গোকুল সামন্ত, দি প্রাইমা প্রিণ্টার্স,
৪৫, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-৮৯,
বাইণ্ডিং ওয়ার্কস, কলি-৯

প্রচ্ছদ : ধ্রুবাবতী দেবী

প্রাপ্তিস্থান :

দে বুক ষ্টোর, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট্, কলি-৭৩
নাথ ব্রাদার্স, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট্, কলি-৭৩

আমার মমতাময়ী মমতাজ

৺নিশা রায়ের

স্মৃতির উদ্দেশে

নিজের হাতে গড়া

এই তাজমহল

উৎসর্গ করলাম।

কথা মুখে

হরেস তাঁর 'আর্স পোয়েটিকা'-তে লেখককে কোনো রচনা প্রকাশের আগে নয় বছর অপেক্ষা করতে পরামর্শ দিয়েছেন। এই বাক্যটির সরাসবি বিরোধিতা করেন আমাদেব আধুনিক দেশীয় লেখকবা। এর ভালোমন্দ দু'টি দিকই আছে। লেখা লিখে ফেলে বাখলে তা হয়তো পরে সংশোধিত ও পুনঃ পুনঃ মার্জিত হয়ে, ঘষামাজা হয়ে সাহিত্যের ব্যাকরণ অনুযায়ী প্রকাশিত হয়। .তখন পাঠকরা কাঁচা মালেব তেজী দোষের স্বাদ অনুভব করতে পারেন না। এ যেন বাড়ীতে কেউ এলে ঘরোয়া পোষাক পাল্টে, সেজে গুজে ফিট্‌ফাট্‌ হয়ে তৈরী হওয়া। সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকারা অনেক সময় লেখককে আটপৌবে পরিবেশে লেখকেব স্বতঃস্ফূর্ত তাজা ও অসংশোধিত অভিব্যক্তির প্রকাশ দেখতে চান।

'বিমল রায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' সংকলনে জীবনবোধেব তুলনায় মানুষেব সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, চাওয়া পাওয়া, প্রেম-ভালবাসা, আশা-নিরাশা ও ছলনার প্রাধান্য বেশী। চরিত্র চিত্রণে লেখক কল্পনার চেয়ে অভিজ্ঞতাকে বেশী মাত্রায় কাজে লাগিয়েছেন। তিনি যা দেখেন ও বোঝেন তা' সরাসরি তাঁব কলমে বেবিয়ে আসে। কোথাও কষ্ট কল্পনা নেই। মেকী আদর্শেব কচকচি নেই। অশ্লীলতা নেই দুর্বোধ্যতা নেই ও অবোধ্যতাও নেই। এবং গল্প লেখার জন্য লেখক সাজিয়ে গুছিয়ে বসেনও নি কখনো।

আমাদের আশে পাশের ইতস্ততঃ ছড়ানো ঘটনা লেখকের মনে যখন ধাক্কা দেয় তখনই লেখক কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়েন।

লেখকের দেখা—লেখকের অনুভব যেন চর্মচক্ষু থেকে পাঠক পাঠিকার মর্মনেত্রে সঞ্চাবিত হয়। এইখানেই বিমল রায় সার্থক। সাধারণ মানুষের অসাধারণ ঘটনা নিয়ে যে অসাধারণ দরদ দিয়ে লেখক গল্পের জাল বুনে চলেছেন তা' সাম্প্রতিক বাজারী সাহিত্যের

কোলাহলের মধ্যে থেকে সহজেই সনাক্ত করা যায়। গতানুগতিক ধারা বজায় রাখতে লেখক অভ্যস্ত নন। এক্ষেত্রে তাঁর গল্পে চিরা-চরিত ধারার বিরোধিতা করা হয়েছে। তবে কোথাও পরীক্ষা নিরীক্ষা নেই। এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উল্টো দিকটা ব্যবহার করে রচনা শৈলীর চাতুর্য্যও প্রকাশ পায়নি।

লেখক মূলতঃ কবি। বহু মঞ্চ-সফল নাটকও তিনি রচনা করেছেন। এই সংকলনের গল্পগুলির রচনাকাল ১৯১০-১৯১৭-র মধ্যে। পাঠক-পাঠিকারা গল্প পাঠ করে বিভিন্ন জেলার ইতিহাস, পুরাকীর্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন। এটা তাঁদের বাড়তি লাভ।

লেখক বিমল রায় নিজের সম্পর্কে সবিনয়ে কিছু কথা বলেছেন,—

"সাধ অনেক—সাধনা কম। সময় প্রচুর কিন্তু সুযোগ অল্প—কারণ এই বৈজ্ঞানিক যুগে নানা ধরণের ইলেক্ট্রনিকস্ নিয়ে সারা দিন কাটে। বহু খুঁজেও সেই সব দুবোধ্য যন্ত্রের বইগুলোর মধ্যে সাহিত্যের একটুও গন্ধ পাইনা।—আসলে প্রফেসর মশাই যদি কয়লার খনিতে কাজ করতে যান তাহলে আমার মতো অবস্থা হবে।

দেশের সেবা করতে জীবনের সবচেয়ে মধুর যৌবন বিলিয়ে দিয়েছি মিলিটারী—অর্থাৎ নেভিতে। সতেরো বছর সেখানে কাটিয়ে ফিলিপ্সে ঢুকেছি ২৩ বছর। অর্থাৎ এই চল্লিশ বছর শুনেছি, বুঝেছি, শিখেছি—কিন্তু লিখিনি।

স্ত্রী ও অন্যান্যদের কাছে উৎসাহ আর অনুপ্রেরণা পেয়েছি অফুরন্ত কিন্তু তখন মন সায় দেয়নি। এখন কিন্তু ঠিক উল্টোটি।

তিন চারটি সাহিত্য সভার সদস্য আমি। সংবর্ধনা পেয়েছি 'সাহিত্য সংস্কৃতি' আসর থেকে। আশে পাশের দশ বিশটা ম্যাগাজিনে প্রায়ই গল্প কবিতা ছাপা হয় কিন্তু সে সব ফাঁকিতে ভরা। আমি সাহিত্যিক নই, লেখক নই আবার কবিও নই। আমি হচ্ছি পাঁচ মিশালি খিচুড়ি।

তিন বছর হোলো বিপত্নীক জীবন কাটাচ্ছি। কন্যা লালী, তার

বন্ধু রাণু আর সবার প্রিয় মলি আমায় অহরহ উৎসাহ জোগায়।

লেখক হবার ইচ্ছা আছে। এখন সুযোগ আছে—সময়ও আছে বলে মনে করি। সবচেয়ে আনন্দ আছে আমার সঙ্গে এই গ্রন্থের সম্পাদক সুশান্ত কুমার পাল।

বিষয় বস্তু সবই নূতন এবং নিজের বা নিজের মতো কারো জীবন থেকে নেওয়া। বিভিন্ন জেলার তথ্য সংগ্রহের জন্য লেখক ভূপতি রঞ্জন দাস মহাশয়ের লেখা 'পঃ বঙ্গ ভ্রমণ ও দর্শন' এবং প্রলয় সেন মহাশয়ের লেখা 'পঃ বাংলার তীর্থ' নামে পুস্তক দুটির সাহায্য নিয়েছি। এর জন্য তাঁদের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ রইলাম।

পাঠক-পাঠিকার শুভেচ্ছা আর সহানুভূতি পাওয়া গেলে আমি প্রতি বছর একটি করে গ্রন্থ রচনা করার আশা রাখি।"

লেখার বাতিক যাঁদের আছে তাঁরা জানেন, লেখার মধ্যে দিয়ে কিভাবে লেখকের স্বরূপ প্রকাশিত হয় ও আত্মতৃপ্তি আসে। নিজের রচনার মূল্য আছে এমন ধারণা থাকে বলেই লেখকের মনে হয় পাঠকরা সে রচনা পড়ে আনন্দ পাবেন, হয়তো উপকৃতও হবেন। পাঠক-পাঠিকাদের ধৈর্য্য ধরে গল্পগুলি পড়তে অনুরোধ করি।

—সুশান্তকুমার পাল
সম্পাদক
কলিকাতা সাহিত্যিকা

সূচী

বাঁশী

সতেরোশো চল্লিশ খৃষ্টাব্দ। মুর্শিদাবাদের নবাব সফর রাজের যুগ। পাটনার শাসনকর্তা আলিবর্দীর সাথে যুদ্ধে সফররাজ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হলেন।

নবাবের মন্ত্রী রায় আলমচাঁদ গর্বভরে, মুচকী হেসে স্ত্রীকে বললেন, এই নাও গিন্নী তোমার যোগ্য পুরস্কার। আমার শ্রেষ্ঠ বাহাদুরীর বিনিময়ে এ পাওনা যৎসামান্য। দেখো, কত মোহর, কত টাকা। এ সবই তোমার।

—সবই আমার! খুব খুশী ও আশ্চর্য্য হয়ে স্ত্রী শুনতে চাইলো তার স্বামীর সেরা বাহাদুরীর সত্যকার ঘটনা।

শোনো বলি। আলমচাঁদ কণ্ঠে উচ্ছ্বাস ও চোখে বীরত্বের ছাপ এঁকে বললেন, সরফরাজের কোষাধ্যক্ষ জগৎশেঠ, আমি আর ঐ আলিবর্দী তিনজনে জোট বাঁধলাম। জগৎশেঠ রাজকোষ থেকে তিন কোটি টাকা সরিয়ে ফেলল। ঐ অর্থের একাংশ নিয়ে আমি বহু সৈন্যকে ঘুষ দিলাম। প্রধান নায়ক হিসাবে অস্ত্রাগারে গিয়ে সফররাজের বারুদের স্তূপে মিশিয়ে দিলাম বালি আর ধূলো। আলিবর্দী বিদ্রোহী হয়ে সরফরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। উভয় পক্ষের কামান গর্জন করে উঠলো নবাব সরফরাজ ধূলোর ঝড় তুললেন—। হেরে গেলেন। আলিবর্দী নবাব হলেন। আমায় দিলেন বাহবা আর প্রচুর মোহর। জগৎশেঠের দোষ মার্জনা করা হোলো। তিনিও আমায় ইনাম দিলেন। তুমি রাজরানী হয়ে এখন টাকার গদিতে শুয়ে দিন কাটাও।

স্ত্রী আঁতকে উঠে বললেন, ছি! ছি! তুমি এতবড় বিশ্বাস-ঘাতকতা করলে? এই নবাব সরফরাজ একদিন তোমায় রাস্তার ভিখারীর দশা থেকে তুলে নিয়ে মন্ত্রী করেছিলেন, আর সেই তুমি তার

সাথে নিমকহারামী করলে? তোমার মত শয়তানের কি সাজা জানো?

—সাজার ভয় নেই গিন্নী। সরফরাজের তিন শিশুপুত্র কখনও যদি নবাব হতো তখনই তারা আমায় সাজা দিতে পারতো। আমি কি এতই বোকা! আজ প্রাতে নিজের হাতে সেই তিনটে পথেব কাঁটাকে সরিয়ে দিয়েছি,—তাদের হত্যা করেছি।

স্ত্রী আরো উত্তেজিত হয়ে বললো, পাপী, কাপুরুষ, নিষ্ঠুর! পাপ খণ্ডন করতে তোমার এই মুহূর্তে গঙ্গায় ডুবে মরা উচিত। আমি তোমায় এই শেষ প্রতিজ্ঞা শোনাচ্ছি। আগামীকাল আমি তোমার দুই শিশুপুত্রকে বুকে নিয়ে গঙ্গায় ডুবে মরব। তোমায় কাছে পাবার চেয়ে বিধবা হবার জ্বালা অনেক কম।

ঐ রাতে সারা মুর্শিদাবাদের আকাশ জুড়ে থমকে দাঁড়িয়ে ছিলো ঘন মিশকালো মেঘ। মেঘেব কালো রঙ ভেদ করে, খানিকটা অঙ্গ আলোকিত করে বিদ্যুৎ ঝিলিক মেরে চমকে উঠছিলো মাঝে মাঝে। জনগণ শুনছিলো শ্যামাপূজার রাতের মত দিগন্তের প্রতিটি প্রান্তে গুপ-ঘাপ গুম-গাম, বুড়-বুড়, পড়-পড় শব্দে মেঘের রাজ্যে বাজী ফাটানোর শব্দ। এক পশলা বৃষ্টিও হয়েছিলো সে রাতে। মনস্তাপে জর্জরিত আলমচাঁদ ঐ রাতে স্ত্রীকে বন্দী করে রেখে গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরেছিলো গঙ্গায়।

তা না হয় হোলো। উনিশশো বাষট্টির পয়লা জানুয়ারী থেকে মুর্শিদাবাদের দক্ষ গাইড, সুবক্তা যুবক, মিষ্টভাষী ও মিশুকে ছেলে হরি গেল কোথায়? চারিদিকে শুধু একটি প্রশ্ন, হরিকে কোথাও দেখেছো? রিক্সা ছুটিয়ে রিক্সাওলারা শহরের সর্বত্র খুঁজেছে। মাঝিরা তন্ন তন্ন করে দেখেছে নদীর দু'টি পাড়। দোকানদার, ফেরীওয়ালা, পথচারী, নবাগত বাসযাত্রী, ট্রেন যাত্রীরা সবাই খুঁজেছে মুর্শিদাবাদের নিমাইকে, শেষে সকলে হাল ছেড়ে দিয়েছে।

শেষ আশা ছাড়েনি শুধু মামুদ। হরির বন্ধু সে। এক বয়সি, একই স্কুলে পড়েছে ওরা। ম্যাট্রিক পাশ করে, মুর্শিদাবাদের বহু

ঐতিহাসিক খবর সংগ্রহ করে হরি শুরু করেছিলো গাইডের কাজ। সন্ধ্যায় বসে সে বাঁশী বাজাতো আর মাঝে মাঝে গল্প করতো মামুদের সাথে। মামুদ পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত লেখাপড়া করে বিবাহ ও একটি সন্তান লাভ করেছিল। উপায় করতো খুব সামান্য—যাত্রা করে। যেদিন যাত্রা না করতো সেদিন হয় রিহার্সালে যেতো না হয় হরির কাছে গাইডের তালিম নিতো। মুর্শিদাবাদের কে না চিনতো ওদের। গাইডের কাজে ওরা ছিলো ওস্তাদ আর চ্যালা। একজন হিন্দু, অন্যজন মুসলমান। একজন ফর্সা টুকটুকে, অন্যজন কালো, মিশকালো।

মামুদ পাগলেব মত দিশেহারা হয়ে ছুটেছে চুনাখালি, সাহানগর, মহাদেব বাটি, আজিমগঞ্জ। খুঁজেছে ফর্হাবাদ, বিহারিয়া আর সাকুয়ায়। মামুদের অন্যান্য বন্ধুরা খুঁজে এসেছে বড়নগর, জিয়াগঞ্জ, কুঞ্জঘাটা, জাফরগঞ্জ। সকলে শেষে ভেবেছে হরিকে কেউ হত্যা করেছে। অনেকে বলেছে সে হয়তো কোনো অসৎ কাজ করে ধরা পড়ে জেলে পচছে। কেউ আবার সন্দেহ করেছে, হরি সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগী হয়েছে।

গঙ্গার পাড়ে বসে মামুদ প্রায়ই হরির কথা ভাবতো। পুরানো দিনেব মধুব স্মৃতিগুলো তাকে ভীষণ আনন্দ দিতো।

হাতে খড়ি দেবার সময় হরি তাকে শিখিয়েছিলো শিয়ালদা থেকে একশো বাইশ মাইল দূরে মুর্শিদাবাদ অবস্থিত। এর উত্তর পূর্বে গঙ্গানদী, দক্ষিণে নদীয়া আর পশ্চিমে বীরভূম জেলা। ম্যাপ দেখিয়ে হরি তাকে বুঝিয়ে ছিলো কি সুন্দর ভাবে গঙ্গানদী এই জেলাকে উত্তর দক্ষিণে সমানভাবে ভাগ করেছে। মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমরা পরপর কিভাবে রাজত্ব করেছেন সে তালিকা মামুদকে মুখস্থ করতে হয়েছিলো।

মুর্শিদকুলি খাঁর নামানুসারে এই জেলার নাম রাখা হলেও এ রাজ্যের নাম আগে ছিলো মকসুদাবাদ। কুলি খাঁর মৃত্যুর পর তার জামাই সুজাউদ্দৌলা হলেন নবাব। তারপর সুজাউর পুত্র সফররাজ

নবাব হলেন। এরপর আলিবর্দী। তারপর তাঁর দৌহিত্র সিরাজ-উদ্দৌলা। সিরাজকে হত্যা করিয়ে নবাব হলেন আলিবর্দীর ভগ্নিপতি বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর। এরপর তাঁর জামাতা মীরকাশেম। তাকে সরিয়ে দ্বিতীয়বার নবাব হলেন ঐ নামকরা বিশ্বাসঘাতকটা। মীরজাফরের পরে পরপর তিন ছেলে নাজমুতদ্দৌলা, সাইফুদ্দৌলা এবং মোবারকদ্দৌলা। তারপর এসেছেন বাবর আলি, আলিজা, ওয়ালজী, হুমাউনজা। শেষের দিকে এলেন ফেরাতুনজা, হাসান আলি, ওয়াসফ আলি এবং শেষ নবাব ছিলেন ওয়ারিশ আলি।

মামুদকে আরো অনেক কিছু শিখতে হয়েছিলো। সতেরোশো সাতান্ন সাল পর্য্যন্ত এই মুর্শিদাবাদে ছিল স্বর্ণযুগ, স্বর্গরাজ্য। সাতান্ন থেকে পঁচাত্তর পর্য্যন্ত এদেশে ছিল নবাবের নামধারী ইংরেজ বণিকদের তাবেদারের যুগ।

বছর খানেক আগে লাক্সারী বাসে করে বাহান্ন জনের একটা দল এসেছিলো এখানকার দর্শনীয় স্থানগুলি দেখতে। হরির ইসারা মত মামুদ ওদের নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। সে বলেছিলো, মুর্শিদকুলী খাঁ জন্মসূত্রে ছিলেন হিন্দু, ব্রাহ্মণ। দাস ব্যবসায়ীরা তাকে চুরি করে এক ধনী মুসলমানের কাছে বিক্রয় করেছিলো। সেইখানেই তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ভাবতে বড় কষ্ট লাগে যে তিনি শেষ জীবনে ঘোর হিন্দু-বিদ্বেষী হয়ে ওঠেন। বার্ধক্যে পৌঁছে তিনি তার এক হিন্দু-বিদ্বেষী বিশ্বস্ত অনুচর মোরাদ ফারাস খাঁকে একটি মসজিদ তৈরী করার ভার দিলেন। চারিপাশের নামকরা হিন্দু দেবমন্দির ধ্বংস করে তার মালমশলা সংগ্রহ করে ঐ মসজিদ্ তৈরী করা হোলো। অবশ্য মৃত্যুর আগে এই দুষ্কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে পাপ খণ্ডন করতে মুর্শিদকুলী খাঁ ঐ মসজিদের সিঁড়ির নীচে একটি ঘর তৈরী করিয়েছিলেন।

মামুদকে থামিয়ে হরি বলেছিলো, মৃত্যুর পর তাঁর ঐ ঘরে তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়েছিলো। সাধুজন যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠবে তখন ঐ সমাধি ঘরের উপর তাদের পদধুলি পড়ুক এই ছিলো মুর্শিদের শেষ

বাসনা। তার ইচ্ছামত এই মসজিদে একটা বাজাব বসানো হয়েছিল। কাট্‌রা অর্থে গঞ্জ বা বাজার। তাই এই মসজিদকে বলে কাট্‌রা মসজিদ।

হরির কথা শেষ হতেই মামুদ বলেছিলো, ঐ দেখুন জগৎজয়ী বা জাহানকোষা কামান। নামতা মুখস্থ বলাব মত গড় গড় কবে মামুদ প্রচাব কবলো কামানের ইতিহাস। এটার দৈর্ঘ বাবো হাত, বেড় সওয়া তিনহাত, আগুন ছোঁয়াবার ছিদ্রটিব ব্যস দেড ইঞ্চি। ওজন দু'শো বাবো মণ। দাগতে প্রতিবাব আঠারো সেব বারুদ লাগতো। ঢাকাব খ্যাতনামা জনার্দন কর্মকাব এই কামান তৈবী করেছিলেন। তারপর মামুদ দেখিয়েছিলো বাচ্ছাওয়ালী তোপ। সেই তোপের গুরুগম্ভীব আওয়াজ সামলাবার জন্য প্রতিবার কামান দাগবার আগে দশ পনেরো মাইল এলাকাব মানুষকে সাবধান করে দেওয়া হোতো। সেটা দাগতে আধমণ বারুদ লাগতো। সেই কামানের মারাত্মক আওয়াজ শুনে একবার এক গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত হয়েছিল। তাই সেই কামানেব নাম বাচ্ছাওয়ালী তোপ।

হরি সেদিন দেখিয়েছিল পৃথিবীর বৃহত্তম ইমামবাড়া। হাজার দুয়াবীব ভিতরেব সবকিছু সুন্দর করে বুঝিয়েছিলো হরি। একতলায় রাখা আছে পলাশী যুদ্ধে ব্যবহৃত ঐতিহাসিক সর্বরকম অস্ত্র। তাছাড়া সিরাজ, আলিবর্দীর ব্যবহৃত তলোয়ার, বিক্রমাদিত্যের বর্শা, নাদির শাহের ঢালও সযত্নে রাখা আছে সেখানে। তিন তলার আর্টগ্যালারীতে ছিল নবাবদের তৈল চিত্র, বহু দেশী-বিদেশী শিল্পীদের আঁকা বহুমূল্য চিত্র। তিন তলাব পূর্বদিকে ছিল ভারতের বহু স্মৃতি ধরে রাখা নিজামত লাইব্রেরী। অনেক নবাবের লেখা পাণ্ডুলিপিও ওখানে রাখা আছে।

হরির কথার মাঝেই মামুদ বলেছিলো, দীর্ঘ আঠারো বছর ধবে মুর্শিদাবাদ আর নদীয়ার শত শত রাজমিস্ত্রীরা একযোগে কাজ করে এই মনোরম প্রাসাদ নির্মাণ করে বিদেশীর কাছে খুবই প্রশংসা পেয়েছিলো।

যাত্রীদের ঐ দলকে মামুদ নিয়ে গিয়েছিলো সত্যপীঠ, কিরীটেশ্বরীর মন্দিরে, মতিঝিল, হীরাঝিল আর কাঠগোলার বাগানে। প্রতিটি স্থানের বর্ণনা দিতে দিতে ওরা এগিয়ে গিয়েছিলো খোসবাগ, রাণীবাগ, রাধামাধব আর রাণীভবানীর মন্দিরে। সেদিন ওরা মোট পারিশ্রমিক পেয়েছিলো দেড়শো টাকা। মামুদকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে হরি বলেছিলো, এবার তো তুই একা একা একাজ পারবি। তোর ট্রেনিং শেষ হোলো।

হরির অন্তর্ধানের পর তিনটে বছর কেটে গেছে।

সেদিন মামুদ গঙ্গার পাড়ে একা বসেছিলো মনমরা হয়ে। হঠাৎ শুনলো এক অবিশ্বাস্য সংবাদ। দেশের ছেলে দেশে ফিরে এসেছে। হরি আবার এসেছে মুর্শিদাবাদে। মামুদ ছুটলো সংবাদ যাচিয়ে নিতে। কথাটা সত্য। খবর মিথ্যা নয়। কিন্তু সে একি দেখলো! এতো সেই হরি নয়। খোঁচা-খোঁচা গোঁফ দাড়ি। রুগ্ন কঙ্কালসার চেহারা, চিবুক আর চোখ দুটো গর্তে ঢোকা। মাথায় যেন জটা, পরনে ছেঁড়া পাজামা আর চিট্‌চিটে একটা গেঞ্জী। পাগলের মতো হরি হাঁটছে কেন? মুখে সব সময় বিড়বিড় করে কি সব বলছে যেন। তার প্রত্যাবর্তন মুর্শিদাবাদের জনগণের কাছে ব্যথাময় হয়ে উঠলো।

মুর্শিদাবাদেরও ঠিক এই দশা হয়েছিলো সতেরোশো সাতান্ন খৃষ্টাব্দে। বিধাতার অভিশাপে, প্রকৃতির বিরূপতায় এসেছিলো দুর্ভিক্ষ, মহামারী। জেলার যেটুকু সমারোহ ও জৌলুস বাকি ছিলো তাও মুছে দিয়েছিলো অর্থলোভী ঐ অত্যাচারী শয়তান দেবী সিং। নিষ্ঠুর ইংরেজদের সহযোগিতায় মতলবাজ দেবী সিং রাতারাতি রাজস্ব বিভাগের সর্বময় কর্তা হয়ে প্রজাদের কাছে রাজস্ব আদায়ের নির্মম যজ্ঞ শুরু করেছিলো। সে অত্যাচারের কাহিনী, সেই চাবুক মারার সুস্পষ্ট দাগ এখনও এদেশ থেকে মুছে যায়নি। ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে অসহায় নিরীহ জনগণ যখন দেশ ছেড়ে পালাতে ব্যস্ত তখন এই দেবী সিং তাদের নিঃস্ব, উলঙ্গ করে লুটে নিয়েছিল তাদের শেষ সম্বল, মান-সম্মান। মুর্শিদাবাদ হয়েছিল শ্মশানক্ষেত্র।

শ্রীহীন মুখমণ্ডল, ম্লান দৃষ্টি নিয়ে একদিকে চেয়ে থাকা হোলো হরির কাজ।

—তোমার কি হয়েছে? এমন তো ছিলে না? তোমার এ হাল কে করলো?

এ ধরনের বহু প্রশ্নের উত্তরে হরি শুধু নীরব থেকে সামান্য একটু হেসেছে। হাসির অর্থ করলে মনে হয়, জাঁকজমক আর সৌন্দর্য্যের মৃত্যু হয়েছে। হরির অতীত ধ্বংস হয়েছে, তার বর্তমানে নেমেছে ধ্বস। তার আশা আকাঙ্ক্ষা আর চিন্তাধারায় এসেছে হাহাকার। তার হাতে বাঁশী ধরা থাকে। বড় একটা কেউ শুনতে পায়না বাঁশীর সেই সুর।

সাপুড়ের ছোট্ট চুবড়ী থেকে সাপ বাইরে এসে যখন ফণা বিস্তার করে তখনই উপলব্ধি করা যায় সাপের রূপ, সৌন্দর্য্য আর গাম্ভীর্য্য। হরি বাঁশীর গর্তে যখন ফুঁ দিতো তখনই বেরুতো মিষ্টি সুর। সুর ছড়িয়ে পড়তো ঢেউ তুলে। অদ্ভুত শিহরণ, অপূর্ব মাদকতা আর মন মাতানো আলোড়ন তুলে সুর নিজেকে বিস্তার করতো সারা মুর্শিদাবাদের প্রতিটি প্রান্তে। ভাগীরথীর স্রোতের মৃদু কাঁপুনির সাথে ঐ সুর মিশে যেতো। তারপর তালে তাল মিলিয়ে হেলেদুলে এগিয়ে যেতো মহাসমুদ্রের এক কেন্দ্রবিন্দুর দিকে।

সেদিন হঠাৎ বাঁশী বাজালো হরি। হাজার দুয়ারীর কাছে যেখানটাতে ভাঙ্গন রোধ করতে পাথর আর লোহার জাল দিয়ে মজবুত করে বাঁধ দেওয়া হয়েছে সেই খানটায় বসেছিলো সে। মামুদ এসে ওর পাশে বসলো।

—এখানে এলি কেন? কি চাস্? উঠে যা। বললো হরি।

—না উঠব না। আজ না শুনে যাব না।

—কি শুনতে চাস্?

—শুনতে চাই সেই ঘটনা—যা তোর সর্বনাশ করেছে।

—চুপ করে বোস্! ভূত বিশ্বাস করিস্?

—করি, তবে রাতে। দিনের বেলায় নয়।

—রাধামাধবের সেই ঘটনাটা বল্‌তো শুনি।

মামুদ শুরু করলো। আলিবর্দীর বড় জামাই নৌসেজ মহম্মদ খাঁ একবার রাধামাধবের মন্দিরের সেবাইতের কাছে দুটো জবাফুল ঢাকা দিয়ে একবাটি গোমাংস পাঠিয়েছিলো পূজো দিতে। সরল মনে পূজো দিয়ে সেবাইত বাটি ফেরৎ দিলো কর্মচারীর হাতে। ঢাকা দেওয়া ফুলগুলো তুলে কর্মচারী দেখলো বাটীতে এতটুকু ঐ নিষিদ্ধ মাংস নেই। বাটি ভরা ছিলো একরাশ যুঁইফুল।

হরি হা হা করে হেসে উঠলো। চীৎকার করে বললো সব ধোঁকাবাজী, ধাপ্পাবাজী। তুই ভগবান দেখেছিস কখনও?

—কেন দেখবো না।

—কোথায় দেখেছিস?

—যাত্রার আসরে। কৃষ্ণ, বিষ্ণু, নারায়ণ! আমিও তো ভগবান নারদ সাজতাম। নারদের এক্টো শুনবি নাকি। মামুদ মুহূর্তের মধ্যে চোখে ভাবালু দৃষ্টি এনে গলা ঝেড়ে বললো, হে প্রভু! এ ধরার মানুষ, জীব-জন্তু, কীটপতঙ্গ এমনকি গাছপালাও তোমারই সৃষ্টি! নদী, সমুদ্র, আকাশ, বাতাস, তোমার তৈরী। তোমার এই লীলাখেলার কথা চিন্তা করলে চোখে জল ভরে উঠে।

হি-হি-হি-হি করে হরি আবার হাসলো। বললো, দেখ মামুদ, চেয়ে দেখ নদীর ঢেউগুলো কেমন মুখে ফেনা তুলে পাড়ে এসে ধাক্কা মারছে। ওরা বোঝে না দুদিন পরেই ওদের খেলা বন্ধ হয়ে যাবে। যা চলে যা। আমার পিছু পিছু ঘুরছিস কেন?

—শুনব বলে। আজ না শুনে উঠব না।

—তাহলে প্রতিজ্ঞা কর, কাউকে বলবি না।

—খোদাকী কসম্!

—শোন তাহলে। গিয়েছিলাম জাহাজে, সাহেবদের কাছে, কাজ নিয়ে।

—কি কাজ করতিস?

—সামান্য কাজ কিন্তু অফুরন্ত বিশ্রাম আর অগাধ পয়সা।

—সামান্য কাজ মানে ?

—সাহেবদের জামা জুতো বেডি করা, বিছানা ঝাড়া আর মদ খাওয়ানো।

—অগাধ টাকা কে দিতো ?

—আমি বাঁশীতে ওদের ইংরাজী গানগুলো বাজাতাম। ওরা হাততালি দিয়ে নাচতো আর বাঈজীকে ছুঁড়ে দেবার মত আমার দিকে ছুঁড়তো নোট। এছাড়া ওরা মাঝে মাঝে বেশী মদ গিলে জামা-প্যাণ্টে প্রস্রাব-পায়খানা করে রাখতো—সে সব সাফ করে দিতাম। মোটা বকশিস পেতাম। তিন বছরে পনেরো হাজার টাকা জমিয়ে ফেললাম।

—বাপ্‌রে! পনেরো হা-জা-র। টাকায় সের চাল। তার মানে তুই তো বড়লোক হয়ে গেলি রে!

—রাজপুত্তুরের মত চেহারা নিয়ে বাড়ী এলাম ক'দিনের ছুটিতে। ভাঙ্গা পোড়ো বাড়ী ভেঙ্গে নতুন বাড়ী করলাম। একটা বিয়ে করলাম। অপরূপ সুন্দরী বৌ। হাসলে দুটো গালে টোল পড়তো রে। ভরা যৌবন! সারাদিন তাকে বুকে অাঁকড়ে রাখার ইচ্ছায় চাকরী ছেড়ে দিয়ে একটা মুদীখানার দোকান খুল্‌লাম।

—ভুল করলি।

—কেন ?

—মুদীর দোকানে লাভ নেই। শুধু ধারে কারবার।

—ঠিক বলেছিস্! প্রথমতঃ বাড়ী তৈরী, বিয়ের খরচ, বৌকে ষোলো ভরি সোনাও কিনে দিলাম। তারপর ঐ দোকান খুলতেও টাকা। শেষকালে যাও হাজার দেড়েক ছিল, বৌ নিয়ে ঘুরতে বেড়াতেই ফতুর হয়ে গেলাম।

—জাহাজে ফিরে গেলেই পারতিস।

—তাই গেলাম। যে জাহাজ আমায় অর্থ, বৌ আর বাড়ী দিয়েছে তাকে অবহেলা না করে ফিরে গেলাম জাহাজে। বৌটার সে কি কান্না। শেষ রাতটা আমার বুকে মাথা রেখে কেঁদেই কাটালো।

মায়ের কাছে তাকে রেখে চলে গেলাম। আবার বাঁশী বাজালাম। আবার পয়সা!

—তোর ভাগ্য দেখলে ভালই লাগে কিন্তু এই সময় যদি পাঁচশোটা টাকা পেতাম তাহলে শ্লা ঐ ইব্রাহিমের বোনটাকে নিকে করতাম। ছ্যা! আমার বৌটা শ্লা চিররুগ্না! বল্, তারপর।

হরি নদীর দিকে চেয়েই বললো, বড় জ্বালারে মামুদ। আচ্ছা মামুদ তোর সেই দানশা ফকিরের গল্পটা মনে আছে?

হ্যাঁ! মামুদ ছড়া মুখস্থ বলার মত বলে চললো, সিরাজউদ্দৌলা হেরে গেল। দেখলো চারিদিকে জগৎশেঠ, রাজবল্লভ আর মীরজাফরের মত কুচক্রীর দল তলোয়ার উঁচিয়ে আছে। তাই সিরাজ অতি গোপনে মাত্র একজন অনুচর ও স্ত্রী লুৎফাউন্নিসাকে সাথে নিয়ে ভগবান গোলার দিকে পালালো। অর্থলোভী এবং ফকিরের নামের কলঙ্ক ঐ দানশা ফকির সিরাজকে আশ্রয় দিলো। গভীর রাতে সিরাজ যখন ঘুমিয়েছিলো তখনই মীরজাফরের পুত্র মীরণ এসে তাকে বন্দী করলো। ঐ শালা দানশা যদি অর্থের লোভে নিজে গিয়ে গোপনে এখবর না দিতো তাহলে কি সিরাজকে জাফরগঞ্জ প্রাসাদের কক্ষে বন্দী থেকে মহম্মদী বেগের হাতে নির্দয় ভাবে মরতে হোতো? তবে একটা কথা। যে মানুষ সৃষ্টিকে ধ্বংস করে ভাবে যে সে নতুন সৃষ্টি করলো, ইতিহাস তাকে ক্ষমা করে না। তাই ঐ সিরাজের কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মানুষ যখন ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ী ফেরে তখন তারা ঐ পাশেই রাখা দানশা ফকিরের কবরে থুথু ফেলে আসতে ভোলেনা।

কে কার গল্প শোনে! গল্প শেষ হতেই মামুদ দেখ্‌লো হরি আপন মনে পাড় বেয়ে হেঁটে চলেছে। তাকে ধরে জোর করে বসিয়ে মামুদ বললো, গল্পটা শেষ কর। বল্‌না তোর এমন হোলো কেন? আমার মনে হয় সেই নবাব সুজাউদ্দৌলার মত মদে আর মেয়ে মানুষে তুই নিজেকে সর্বস্বান্ত করলি।

বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে মিনিট পাঁচেক বাঁশী বাজিয়ে হরি বললো,

বিদেশে একদিন জাহাজের ডেকে বসে এই সুরটাই বাজাচ্ছিলাম। কাছে এসে দাঁড়ালো এক বিদেশী। জাহাজে শাকসব্জী আর মাংস সাপ্লাই দিতো লোকটা। যেন একটা দানব। উঃ! এইসা লম্বা, এইসা মোটা। আমি বাঁশী থামাতেই সে বললো, আহা! কি মিষ্টি তোমার বাঁশীর সুর। কি অদ্ভুত বাঁধুনী তোমার সুরের প্রতিটি ভাঁজে। তোমার সুরের লহরী মনে হয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করে ছুটে চলেছে অনু-পরমাণুর অস্তিত্বের খোঁজে। জীবনে শুনিনি এমন দরদী সুর। ভারতে ছিলাম বহুদিন। তাই ভাল হিন্দী বলতে পারি। সত্যই তুমি গুণাতীত। বাড়ীর সকলকে তোমার কথা শুনিয়েছি। এই ক্ষুদ্র একটা জাহাজ যে তোমার মত পৃথিবী বিখ্যাত বংশীবাদককে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তা তারা বিশ্বাস করে না। তুমি দয়া করে আমার বাড়ী একবার আসবে ভাই। কাছেই আমার বাড়ী।

—কি করলি তুই? গিয়েছিলি তার বাড়ী? আমিও এইভাবে বহু গাঁয়ে গঞ্জে গেছি যাত্রা করতে। নারদের ভূমিকায় আসর মাৎ করে দিতাম। একটু শুনবি? নারদ বলছে, হে প্রভু, তুমি ভাগ্যবান, দয়াবান, কল্যাণময় আর করুণাসিন্ধু। আজ যারা ছুনিয়ার হৃতসর্বস্ব তাদের জীবনের সকল দুঃখ মোচন কর প্রভু। তাদের ধন দাও, মন দাও, ভক্তি দাও, আর শান্তি দাও। কি? কেমন লাগলো? সেই দানব-দৈত্যের বাড়ী গেলি?

—গেলাম। আমায় নিয়ে গিয়ে বসালো একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর চারতলার একটা ঘরে। নির্জন বাড়ী। শুধু সে আর আমি।

—সে তো হবেই। আমাদের যাত্রার দলকেও প্রথমে রাখা হোতো নির্জন পোড়ো ভাঙ্গা একটা স্কুল বাড়ীতে। যাত্রা করতাম কিন্তু অন্য জায়গায় ঘেরা প্যাণ্ডেলের ভিতর। যাত্রার মাষ্টার ভ্রু কুঁচকে বলতো, সংস্কৃতের বর্ণ পরিচয় না জানলেও মামুদের উচ্চারণ ক্ষমতা অদ্ভুত। সামনের জন্মে মামুদ পুরোহিত হয়ে জন্মাবে। ঐ যে নারদ বলছে, নৈনং ছিদন্তি শাস্ত্রানি, নৈনং দহতি পাবক! অর্থাৎ আত্মাকে অস্ত্র

দিয়ে কাটা যায় না, আগুনেও পোড়ানো যায় না। যাক্, কতক্ষণ বাজালি বাঁশী?

—বাজাই নি। বসার ঘরটাতে কোচ, চেয়ার টেবিল পাতা। একধারে খাটে পরিপাটি করে পাতা ধবধবে বিছানা। সে ব্যস্ত হয়ে একের পর এক টেবিলের উপর রাখলো, কেক্, বিস্কুট, কাজু, কিসমিস, আখরোট। হুটোপাটি করে ফ্রিজ খুল্‌লো। টেনে বার করলো তিন বোতল রঙ বেরঙের মদ। তারপর আমায় বললো, এসো শুরু করো। তুমি শরীর এলিয়ে দাও বিছানায়। তুমি এতটা হেঁটে এসে খুব ক্লান্ত হয়েছো। শুয়ে পড়ো। আরাম করে এই সব খাও। মদে শরীর চাঙ্গা হবে। কণ্ঠটা ভিজিয়ে নিয়ে সুর গুলোকে ঝুম্‌কে নাও!

মামুদ তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ঐ এক সাইজের নিটোল তিনটি মদের বোতল দেখতে পাচ্ছিলো। অত্যধিক উচ্ছ্বাসে চোখমুখ ঘুরিয়ে বলল, প্রতিবার যাত্রা করার পর বেশী রাতে বোতল উপুড় করে মদ গিলতাম, ঘুম ভাঙ্গতো পরের দিন বেলা সাড়ে তিনটেতে। আমাদের ডিরেক্টর সাহেব বলতেন, মামুদ ওস্তাদ লোক—এক চুমুকে আধা বোতল টানতে পারে!

মামুদের এত কথার এতটুকুও শোনেনি হরি। গর্তে ঢোকা চোখ দুটো বন্ধ করে গলার শিরা উপশিরাগুলো ফুলিয়ে সে এক মিনিট সুর তুললো তারপর বললো, তাকে বললাম, মদ তো আমি খাইনা ভাই। তাছাড়া ভোরে জাহাজ ছাড়বে। রাত ন'টার মধ্যে জাহাজে ফিরতেই হবে। সময়ও বেশী নেই। আজ বরং আমি চলি!

—তুই হলি শ্লা পাক্কা ভেজিটারিয়ান। সামান্য একটু খেলেই পারতিস্! হাল্কা আক্ষেপ করলো মামুদ।

—নারে, যা কখনও খাইনি তা খাব কেন? সে নানা কায়দায় অনুরোধ জানালো। বলল, আমার এত আয়োজন অবহেলা দিয়ে নষ্ট করে দিতে চাও! অতিথি আপ্যায়ন করার মনের অভিপ্রায়কে তুমি এমনি করে অপমান করতে চাও?

—তার দোষ নেই রে হরি। সব দেশে সব মদের আসরে এই একই নিয়ম। মদ খেতে গেলে সঙ্গী বা সাথী না থাকলে জমে না। তাই অত কাকুতি মিনতি! বল্, তারপর কি করলি?

—বাঁশী হাতে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, বাঁশী শুনবে বলে ডেকে এনে মদ খাওয়াবার জন্য মিথ্যা ব্যাস্ত হচ্ছ। আমি চললাম।

—ঠিক কথা! সে কি বলল?

—বললো, যেতে দোব না। পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে অনেক রকম গালাগালি দিয়ে বললো, যাও—মদ ঢালো।

—বললাম্ তো, সে বেটা মস্ত মালখোর। —তারপর?

—আমি জেদ্ ধরে বললাম, মদ খাবোনা। সে ব্যাটা শয়তানটা শাঁ করে আমার পাশ দিয়ে লাফিয়ে আলমারীর সামনে এগিয়ে গেলো। ঝনাৎ করে আলমারী খুলে নিচের ড্রয়ারটা থেকে বার করলো ধারালো চক্‌চকে একটা ছোরা। আমার বুকের কাছে সেটা ধরে বললো, চালাকি করছো আমার সাথে! যাও, বোসো, মদ ঢালো।

—সে কিরে! হারামজাদা লোকটা তো দেখছি মস্ত গোঁয়ার! আমি হলে তো ঐখানেই শেষ হয়ে যেতাম। কি করলি তুই?

—ছোরার চেহারা দেখে আর ওর চীৎকার শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম। মাথাটা ঘুরে গেল। ধপ্ করে কোচের উপর বসে মৃত্যুর জন্যে তৈরী হলাম।

মামুদ গল্পের মাঝে জমে গেছে। সহানুভূতি জানাতে সে বললো, বুদ্ধি থাকলে অন্ততঃ একটু খেতিস্। আরে, দু এক পেগ্ খেলে কিছুই হয় না। মাথাটা সামান্য ঝিন্ ঝিন্ করে আর চোখে একটু টান ধরে। বেশী খেলে চোখ ঝাপসা হয়ে যায়, ঘুম আসে, মাথাটা ঘোরে, বমি পায়। যাক্ শেষ পর্য্যন্ত তোকে খাইয়ে ছাড়লো? কতখানি গিললি?

—একটুও না। তাকে বুঝিয়ে বললাম, বাঁশী শুনবে বলে ডেকে এনে চার তলার নির্জন ঘরে বন্দী করে রাখলে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে মদ

খাবার জন্যে ছোরা বার করে খুন করতে চাও। জাহাজে ফেরার সময় হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এতটুকু চিন্তা ভাবনা না করে ফিরে যাবার সুযোগ দিলে না। দুর্বল, নিরীহ এক বিদেশী অতিথিকে নিমন্ত্রণ করে এই ধরনের ব্যবহার করছো কেন? আমি সত্যই নির্দোষ। তবু আমার কোনো দোষ থাকলে আমায় মাফ করো। তোমার সামনে জোড় হাতে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। আমায় ফিরে যাবার অনুমতি দাও। ঠিক সময়ে না ফিরলে জাহাজ চলে যাবে। আমি খুব বিপদে পড়ব। আমার বাড়ীতে নব-বিবাহিতা স্ত্রী আছে। মা, ছোট ভাই বোন সব আমায় কাছে পাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে আছে। দয়া করে আমায় ছুটি দাও। কথা দিচ্ছি, পরের বার যখন এই পোর্ট-এ আসব তখন তোমার কাছে বসে প্রচুর মদ খাব, বাঁশী বাজাব। যা চাও তাই করব।

—আহা রে! সিরাজউদ্দৌলা ঠিক এমনি করে আকুল প্রার্থনা করেছিলো নিজের প্রাণ বাঁচাতে। বল্, তোকে ছেড়ে দিল সে?

—নারে, সে আমার পাশে বসে বললো, আমার সব কথা শোনো আগে। তোমায় এখানে আনার অভিপ্রায় বাঁশী শোনা নয়, অন্য ব্যাপারে তোমায় প্রয়োজন। আমার একমাত্র সম্পত্তি এই বিশাল ও মনোরম অট্টালিকা। দুঃখ কি জানো বন্ধু! এটা একটা ভুতুড়ে বাড়ী। ভুতের ভয়ে সব আত্মীয়রা পালিয়েছে। রোজ রাত বারোটায় এখানে শুরু হয় ভুতের নাচানাচি, হুটোপাটি আর বাসন ছোঁড়াছুঁড়ি।

—আ-চ্ছা-আ! ভেবেছিলাম শুধু মদ খাবার গল্প। এবারে তাহলে ভুতের গল্প শুরু! মামুদ একটু নড়ে বসলো।

সে আমার সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে আমার দুটো হাঁটুর উপর দুটো হাত রেখে বলল,—এই বাড়ীটাকে ভুতমুক্ত করে বাস যোগ্য করতে, প্রতিটি আত্মীয় বন্ধুর প্রাণে শান্তি আনতে, আমার ভবিষ্যতের পথে একটা বিরাট ইনকাম জুগিয়ে দিতে তুমি কৃপণতা করছো কেন? কোনো বিদেশী এই বাড়ীতে বসে মদ খেলেই এই বাড়ী হবে পবিত্র।

সব ভুত পালাবে এখান থেকে। তাই তো তোমায় এত করে মদ খাওয়াবার চেষ্টা করছি।

—সে মনে হয় কোনো পীর বা তান্ত্রিক। তুই একচুমুক খেলেই পারতিস্।—ছোরাটা কোথায় রেখেছিলো সে বেটা? মামুদের কণ্ঠে আতঙ্ক!

—ডান হাতে ছোরাটা ধরে সে বললো, তোমায় ছোরা মারব না! এটা শুধু তোমায় ভয় দেখাবার জন্য বার করেছি। তুমি ভারতবাসী, আমাব অতিথি। তোমরা সদাসর্বদা এক মহৎ, দরদী অন্তঃকরণ নিয়ে সারা বিশ্বের জন্য চিন্তা করো। আজ আমার সত্যকার বন্ধু হয়ে যে উপকারটুকু করবে তা পৃথিবীর ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠায় লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে। তোমার এই নিঃস্বার্থ ও নিঃশর্ত আত্মত্যাগ আমি কোনেদিন ভুলব না। নাও, লেখো তোমার ঠিকানা। আমি নিজে গিয়ে নিজের হাতে তোমার স্ত্রীকে দিয়ে আসব পঞ্চাশ হাজাব টাকা। কেউ জানবে না, কেউ শুনবে না, কেউ বুঝবে না সে ব্যাপার। নাও, পরিস্কার করে লেখো ঠিকানাটা।

— বাপরে! শ্লা-আ এ তো ঐ সিরাজের মত অবস্থা রে। দাদু আলিবর্দীকে বন্দী করে রেখে সেও লিখিয়ে নিয়েছিলো তিন কোটি টাকা!—লিখলি ঠিকানা?

—লিখেছিলাম, তবে বৌয়ের নয়, তোর ঠিকানা।

—আমার ঠিকানা দিয়েছিলি? কৈ কেউ টাকা আনে নি তো? আমার একটা আইডিয়া এসেছে। হাতে তুড়ি মেরে মামুদ হঠাৎ কিছু আবিষ্কার করার আনন্দ প্রকাশ করে বললো, ওটা একটা গুপ্তধন ভরা বাড়ী। তুই মদ না খেয়ে ভালই করেছিলি। ঐ যে রে ঘসেটি বেগমের ঐ দরজা জানালাহীন ঘরটা। ওটাতে আছে মালকড়ি প্রচুর। সেই যে এক সাহেব ঐ গুপ্তধন খুঁজতে ঘবে ঢুকেছিল। সে মরেছিল রক্তবমি করে। শালা, ঐ দানবটা তোকেও মারতো ঐ ভাবে।

মামুদের কথা শেষ করার আগেই বাঁশী বেজে উঠলো। সুর

ছোঁয়া দিলো দেহে, মনে, প্রাণের সূক্ষ্ম অবচেতনায়। হরির ব্যথাভরা জর্জর প্রাণটায় নিরাশা, ও কামনা বাসনার সুর ঘুরতে লাগলো এক অশান্ত অসহায় ও অসম্পূর্ণ ভবিষ্যতের নিঃস্ব বাতাসে। হঠাৎ বাঁশী থামিয়ে বলল, জানিস মামুদ, সে আমায় বললো, শুধু মদ খেলেই হবে না, মদে চুর হয়ে ঐ ভুতেদের মত নাচনাচি করে আমায় ঐখানে রাত কাটাতে হবে। তারপর ভোর রাতে আমার নিজের শরীরের খানিকটা রক্ত বার করে ঐ ঘরের দেওয়ালে মাখাতে হবে!

—রক্ত! ওরে শ্লা, মদ, ভুত আবার রক্ত। আমার তো শরীর শিউরে উঠছে রে। নরাধম কোথাকার! বল্ তারপর?

সে আমায় পূজো করার জন্যে মন্ত্র পড়লো। বললো, বন্ধু, তুমি জন্মেছ একা, বড় হয়েছো একা আবার মরবেও একা। হয় আজ না হয় কাল। রক্ত যখন তোমায় দিতে হবে তখন মদ খেয়ে মাতাল হতে দেরী করছো কেন? আমার সামনে যে সুযোগ এসেছে তা আমি ছাড়বো না। সময় কম, আমার ধৈর্য্যও কম। একজন মহৎ অতিথিকে সজ্ঞানে হত্যা করা মহাপাপ। সাতজন্ম আমায় তার জন্যে কষ্ট পেতে হবে। তোমার অনিচ্ছায় যদি আমি তোমায় খুন করি তাহলে ইতিহাস কখনও এই অপরাধ মার্জনা করবে না। ওগো আমার অতিথি, ও আমার গড্ তুমি এই দুর্দিনে আমার আন্তরিক অনুরোধ শোনো। স্বেচ্ছায় মদ খেয়ে একেবারে বেহুঁস হয়ে পড়ো, আত্মবলি দেবার চিন্তা নিয়ে নিজের বাহ্যশক্তিকে ছুটি দাও। তারপর তোমায় আমি এই ছোরা দিয়ে হত্যা করে মহা-আনন্দে সারা বাড়ীর আনাচে কানাচে ছিটিয়ে দেব তোমার রক্ত।

—বাঃ বাঃ, চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে মামুদ আর্তনাদ করে উঠল। নরকের কীট, শ্লার ব্যাটা। খেলি মদ?

—ওর যুক্তিটা ভাল লাগলো। তাই মদ খেতে রাজী হলাম।

—সে আমায় জড়িয়ে ধরে বলল, আমি জানতাম তুমি এ উপকার-টুকু করবে। ক্রাইষ্টের নামে, আল্লার নামে এমন কি ভগবানের নামে শপথ নিলাম আমি যতদিন বাঁচবো ততদিন তোমার বিধবা স্ত্রীকে

পাঠাব হাজার হাজার টাকা। তুমি সত্যই তুলনাহীন। শত্রু মিত্র, জীবন-মৃত্যু, কাঞ্চন-লোষ্ট্র সবই তোমার সামনে এক বস্তু। তোমার নেই কোনো অবসাদ, অশ্রদ্ধা আর কাতরতা। ধন্য তোমার সহ্য, ধৈর্য্য আর অনুভব শক্তি। কথা বলতে বলতে সে রঙিন বোতল খুললো তারপর আমাব বুকের সামনে ঝুঁকে পড়ে একটা গ্লাসে ঢালতে লাগলো অমৃত।

—অমৃত মানে? হ্যাঁরে হরি তুই কোনো দিনও খাসনি মদ? মানে ঐ দামী বিলেতি মদের দাম কত জানিস, বহবমপুরে যাত্রা করতে যেয়ে চুরি করেছিলাম এক পেগ্। ম্যানেজাব ঐ মদ খেতো। বল্, তাবপর?

—হরি চুপ করে একদৃষ্টে মামুদেব মুখেব দিকে চেয়ে রইল।

—বল! চুপ করে রইলি কেন? মামুদ প্রশ্ন কবল।

—না, থাক্, বড় কষ্ট হয় রে মামুদ!

— কিসের কষ্ট?

—গত তিনদিন কিছু খাইনি বে। নাড়ীভুঁড়াগুলো যেন পাক দিচ্ছে। একটু কিছু খাওয়াবি আমাকে?

—তাড়াতাড়ি বলে ফেল, তারপর দু'জনে খেতে যাব। গ্লাসে ঢালার পরই খেলি মদ?

—না, খাইনি। দ্বিতীয় গ্লাসটা টেনে নিলো সে। তাতে মদ ঢালবার সময়টাতেই আমার বুদ্ধি খুললো। একলাফে চেয়ারে উঠেই চট্ করে একটা ভর্তি বোতল তুলে নিলাম। সে আমায় নিজের লোক ভেবে খুব নিশ্চিন্তে দ্বিতীয় গ্লাসটা ভরছিলো। গ্লাস ভরার শেষ মুহূর্তে আমি তৈরী হয়ে নিলাম। মনে মনে গুণলাম এক, দুই, তিন। সে ঘাড় তুলে মনে হয় আমায় গ্লাস তুলে নিতে আহ্বান জানাতে গেল। আমি বোতলটা শূন্যে একপাক ঘুরিয়ে নিয়ে দড়াম করে মারলাম ওর মাথার পিছনটায়। প্রচণ্ড জোরে মেরেছিলাম রে। সে মাথাটা নীচু করে এক পাক ঘুরলো। চোখ দুটো যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছিলো তার। ফিনকি

দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগলো। সে লুটিয়ে পড়লো ঐ বিছানাটার উপর।

—সাবাস্! বাপ্‌কা বেটা তুই। মদ, ভুত আর শেষকালে খুন। কি দারুন তুই! বল্, বল্, থামিস্‌নি! মরেছে তো সে?

—সে বিছানায় শুয়ে কাৎরাতে লাগলো। মনে হোলো সে জল খেতে চাইছে।

—শ্লা, হিসি করে দিলি না কেন!

তার খোলা বোতলটা থেকে খানিকটা মদ তার মুখে ঢাললাম তারপর চলে আসবার আগে তাকে আর একবার মারলাম। তৃতীয় বারও মারলাম। কিনটে বোতল ভেঙ্গে চুরমার হয়ে চারিদিকে ছিট্‌কে পড়লো। তার মুখ চোখ মাথাটা একেবারে থেঁতলে গেল। সে নিস্তেজ হয়ে পড়লো। জাহাজে ফেরার চিন্তায় ছুট্ মারলাম। ঘর ছেড়ে হল ঘরে, হল ছেড়ে বারান্দায়, বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ির মুখে গিয়েই আঁতকে উঠলাম। একটা গোঙানী শব্দ ঠেলে উঠলো আমার কণ্ঠে। দেখলাম, সিঁড়ির প্রথম ধাপে দাঁড়িয়ে আছে একটা ফর্সা উলঙ্গ বিদেশী বুড়ি। দাঁত নেই তাই মাড়ি ফাঁক করে সে হয় হাসছিলো কিংবা কাদছিলো। পা ফস্‌কে গেল ধাপ থেকে। গড়িয়ে নামলাম সিঁড়ির প্রথম স্তর। সিঁড়ির ঘোরার ধাপটায় উঠে দাঁড়ালাম। আবার লাফ দিলাম। নামলাম একতলায়। ছুটে চললাম পোর্টের দিকে। বোট এসেছিলো নিতে। জাহাজে গিয়েই শুনলাম আমার নামে একটা টেলিগ্রাম এসেছে। বাড়ীতে নাকি খুব বিপদ। তাড়াতাড়ি যেন বাড়ী যাই।

বাড়ীতে বিপদ! মামুদ প্রশ্ন করলো। কি একটু ভেবে নিয়ে বলল, ও সব মেয়েদের চালাকী। ছ'মাস ছিলি বৌয়ের কাছে। তিন মাস জাহাজে। তার মানে ঠিক খোকাখুকী কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই। আমিও বিয়ের একবছরের মধ্যে বাবা হয়েছিলাম। বাহাদুরীর ভঙ্গিতে মামুদ হেঁ হেঁ করে হাসলো।

আনমনা হয়ে হরি আবার বাঁশীতে ফুঁ দিয়েছিল। মামুদের

সম্ভাব্য মন্তব্য তার কানের পাশ দিয়ে চলে গেল! বাঁশী থামলো দু-মিনিট পরে। হরি বললো, দিবিনা খেতে!

—নিশ্চয়ই দোব। তারপর কি হোলো বল তাড়াতাড়ি!

—না, আর বলবনা। হরি সম্পূর্ণ পূর্ণচ্ছেদ টানলো।

—কেন ?—বলবি না কেন ?

—তুই প্রচার করে দিবি এখবর।

—খোদাকী কসম্, কাউকে বলব না।

হরি একটু চুপ করে কি ভাবলো। ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে বললো, বোম্বে ফিরে বাড়ী গেলাম। বৌয়ের জন্য যা যা লাগে সবকিছু আগেই কিনেছিলাম। সবই বিদেশী জিনিষ। মনে বড় সাধ ছিলো রাতে নিজের হাতে ওকে পরাবো কচি কলাপাতার রঙের সিফন শাড়ীখানা। ইচ্ছে ছিলো তার সারা অঙ্গে মাখাবো দামী পাউডার। আশা ছিলো তার এলো খোঁপায় ঢেলে দেবে সুগন্ধি সেণ্ট। বড় সখ ছিলো সারা রাত জেগে তার সাথে গল্প করবো, তাকে প্রাণভরে ভালবাসবো। দেখ্ মামুদ, নদীর ঐখানটা দেখ্! হাওয়ার প্রবল দাপট বুক পেতে সামলে নিচ্ছে ঐখানটার জলটা। দেখ্, কেমন পরস্পরকে আলিঙ্গন করে ঘুরপাক খাচ্ছে ঐ ঘুর্ণিজলটা। কিছু দেখতে পাচ্ছিস না তুই ? ঐ খানটায় কবর দিলাম সবকিছু। কেটে, ভেঙ্গে টুকরে টুকরো করে সব কিছু ছুঁড়ে ফেলে দিলাম ঐ ঘুর্ণির গহ্বরটার মাঝখানে!

—কি ফেলে দিলিরে ? চুপ করে রইলি কেন ? কথা বল্, মুখ তোল। মামুদ হরির চিবুক ধরে মুখটা তুললো। দেখলো, দুটো গর্তওয়ালা চোখের শেষপ্রান্তে চিক্ চিক্ করছে দু-চার ফোঁটা অশ্রু বিন্দু। এ কি! তুই কাঁদছিস হরি!

—কাঁদিনি, কান্নাটাকে থামাবার চেষ্টা করছি। ধরা গলায় বলল হরি!

—তুই কী কবর দিলি বললি না তো! ধীরে শুধালো মামুদ।

—অনেক কিছু, সবকিছু।

—সবকিছু মানে ?

—শাড়ী, ঘড়ি, অর্থ, গহনা, স্নো-পাউডার, বৌয়ের সবকিছু কবর দিয়ে শেষে বিসর্জন দিলাম সুখদুঃখ, রোগজ্বালা, মানসম্মান আর জমানো সবটুকু অভিমান ?

—সে কি রে। এমন করলি কেন ? বৌটা বাচ্ছা হতে যেয়ে বোধ হয় মারা গেল ?

—ঠিক বলেছিস্। সে মারা গেল কিন্তু তাকে যমে নেয়নি। তার রূপ, যৌবন, ভালবাসা, মুচকী হাসি, ইসারা, সবটুকু যা আমায় একদিন নিঃসঙ্কোচে সঁপে দিয়েছিলো—এসে দেখলাম বাড়ী ফাঁকা। শীতেব এক ভোরে ঘুমন্ত মায়েব পাশ থেকে উঠে সে গৃহত্যাগী হয়েছে।

— এতো সেই নদেব নিমাই এব মত বে ! কি ব্যাপাব, সন্নাসিনী হয়ে গেল নাকি !

—না, সে তাব বিয়েব আগেব এক প্রেমিক নাগবেব সাথে পালিয়েছে। সে প্রেমিক অবশ্য ধনী ব্যবসাদাব বাপেব একমাত্র ছেলে। তাকে চিনি আমি !

—ইস্, বোতল মারতে পাবলি না তাকে ? আমি হলে, ··

—না মামুদ, মাঝে মাঝে বাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। চমকে উঠি। কি দেখি জানিস্ ! সেই যে দানবটাব ঠিকরে বেরুনো দুটো চোখ। আব ঐ বুড়োটার হাসি। খুন কবাব প্রায়শ্চিত্ত আমি কবেছি বৌ হারিয়ে। বাড়তি সাজা কি পেয়েছিস জানিস ?

—বলনা কি সাজা।

আমি আর বাঁচব নারে। সাজাটা হচ্ছে বড় ব্যথা বুকে। বাশীতে ফুঁ দিলেই বুকে ভীষণ একটা ব্যথা করে। একটা অনুরোধ রাখবি মামুদ ? সব কিছু দিয়েও এই বাঁশীটা দিতে পারিনি। বড সাধের বাঁশীরে। তুই আমার এটুকু উপকার করবিনা ভাই ?

—কি উপকাব করতে হবে ?

হরি বাঁশীধবা হাত দুটোতে মুখ চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

মামুদ এগিয়ে এসে সান্ত্বনা দেবার আগেই হবি নিজের হাত এগিয়ে বাঁশীটা বাড়িয়ে দিলো মামুদেব হাতে। বলল, স্মৃতিটুকু তুই রাখিস্। আর কোন দিন খোঁজ করবিনা। বিদায়,— চলি।

পিছু ফিরে হরি ছুটে চলল নদীর পাড় বেয়ে। মামুদ ছুটতে গিযে হোঁচট খেলো, আগে বাঁশী তারপব সে পড়লো। বাঁশীটা খানখান হয়ে গেল।

শুধু মুর্শিদাবাদে নয়, পৃথিবীব কোনো প্রান্তে কেউ আব হরিব কোনোদিন সন্ধান পায়নি।

সাপের কান্না

কেরালার নামকরা বন্দর কালিকট। কালিকটের ছোট্ট একটি গ্রামে বাস করতো সুশীলা। গ্রামের এক প্রান্তে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে দৈত্যাকার বিরাট এক পাহাড়। পাহাড়ের নাম ওয়েষ্টহিল। এই হিলের উপর ইংরেজরা তৈরী করেছে এক বিরাট অট্টালিকা। এই অট্টালিকায় আগে থাকতো মালাবার পুলিশ কিন্তু এখন থাকে মিলিটারী।

পাহাড়ের চূড়ায় উঠলে দেখা যায় সমুদ্রের পর্বত সমান ঢেউ, দেখা যায় ত্রিবান্দ্রম, ক্যান্যান্নুর আর ম্যাঙ্গালোর। ঐ গ্রামের অনেকে উঠেছে ঐ চূড়ায়। দেখেছে লাখো লাখো নারিকেল গাছ। ঐ গাছের পাতাগুলো পরস্পর মিলে তৈরী করেছে বিশ্বজোড়া এক প্রকাণ্ড গালিচা। সবুজ গালিচায় সূর্য্যের আলো দেয় অদ্ভুত চমক্। দুরবীন দিয়ে দেখলে বোম্বে নজরে পড়ে।

সুশীলার বড় ইচ্ছা ঐ চূড়ায় উঠতে। ছোট মেয়েরা অত উঁচুতে উঠতে পারেনা, তাই সুশীলার ঐ ইচ্ছা একসময় বেড়েছিলো আপন গতিবেগে। এখন ঐ কামনা কমেছে আপন গতি রোধে। এখন সে বড় হয়েছে। তার ঝাঁকড়া চুলে বাঁধে মস্ত খোঁপা। যৌবন জোয়ারে ভেসে চলা চোখ দুটোতে লাগায় কাজলের লম্বা টানা। সারা শরীরে লজ্জা আর লজ্জা।

আজকাল আশপাশের গ্রাম থেকে গোবিন্দন, মুকুন্দন, কৃষ্ণাণ নামে অনেক ছেলে জড় হয় ওদের গ্রামে। সময় অসময় জ্ঞান হারিয়ে ওরা সুশীলার বাড়ীর কাছে বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা মারে। সিনেমার হিরোর কায়দায় কথাবার্তা, চুলকাটা, চলাফেরা ওরা অনেকে রপ্ত করেছে। ভিলেনের ছন্দে ওরা নিজেদের রথী মহারথী মনে করে।

পরিবেশকে জমিয়ে তুলতে নানা আকর্ষণীয় চেঁচামেচি, হৈ চৈ, লাফালাফি করে অনর্থক নিজেদের আত্মহারা করে রাখে। আড়চোখে কিংবা ট্যারা চাউনি নিয়ে অহরহ সুশীলার দিকে তাকায়। ওদের ঐ সস্তা আর কাপুরুষচিত অঙ্গভঙ্গীতে খুসী না হয়ে সুশীলা উঠান ছেড়ে ঘরে ঢুকে পড়ে। হিরোয়িনের মন রাঙাতে ব্যর্থ হয়ে ঐ আশাভঙ্গের দল সাংঘাতিক মনমরা হয়ে গৃহে ফেরে। ফেরার পথে বাবে বারে থমকে দাঁড়ায়, পিছু ফিরে কি যেন দেখার চেষ্টা করে। তারপর চীৎকার করে জানিয়ে যায় পরের দিন কতজন কোন সময়ে আবাব কোন স্থানে মিলিত হবে।

উঠানেব পশ্চিম কোণের হাজারী নারকেলগাছটার ছায়াটুকু সুশীলার বড় প্রিয়। সে ভালবাসতো ঐ হেলেপড়া গাছটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতে। ঐ পাহাড়ের উপরে অট্টালিকার রেলিং ঘেরা বারান্দাটা ছিল সুশীলার খুব চেনা। মিলিটারীরা অনেকে ঐখানে দাঁড়াতো। সুশীলা নীচু হয়ে তাদের আবছা দেখতো। ভাব্‌তো মিলিটাবীরা কত ভাগ্যবান। প্রথমতঃ পাহাড়ের উপর, তার উপরে, অট্টালিকায় যারা থাকে তারা হয়তো কতখুসী, কতসুখী। সে থাকে কুঁড়ে ঘবে এক অজ-গাঁয়ের মধ্যে। ঐ অট্টালিকায় কত আলো, কত বাতাস !

সেদিন বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল মিলিটারীর ছেলে ভাস্করণ। দুরবীন হাতে নানা কিছু দেখতে দেখতে হঠাৎ দেখেছিলো সুশীলাকে। প্রতিদিন একই সময়ে সে দুরবীন হাতে দাঁড়াতো বারান্দায়। উঠানের দিকে যন্ত্র ঘুরিয়ে লক্ষ্য করতো সুশীলার হাবভাব, চলাফেরা। সুশীলাও দেখতো ভাস্করণকে। মেঘের আড়ালে থাকা মেঘনাদের অস্তিত্ব পেলেও কোনো দিনও খুব স্পষ্ট করে ভাস্করণের মুখটি দেখতে পেতোনা। অত উঁচুতে থাকা মুখ শুধু সে কেন, ঈশ্বরের সৃষ্টি কোনো দৃষ্টিই পেতোনা দেখতে।

দুরবীন নিয়ে মজা করতে দাঁড়িয়ে সেদিন ভাস্করণ হঠাৎ একটু দুষ্টুমি করে ফেলল। ঐ বারান্দা থেকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বসলো,

সুশীলাকে। মেয়েদের একা পেলে দুষ্টু, বজ্জাত বা ইয়ারবাজ ছেলেরা এমনটি প্রায়ই করে। এ ডাকের বদ অর্থ, নীচে দাঁড়িয়ে কেন, উপরে এসো। কিংবা, ওখান থেকে কি দেখছো? কাছে এসে দেখ!

সুশীলা লজ্জা পেলো। অনেকক্ষণ পরে আবার উপরে তাকালো। আবার লজ্জা পেলো। মনে ভাবলো অনেক কিছু, শেষে মেনে নিলো ব্যাপারটা। দুষ্টুমী করে কোনো ছেলে যদি তাকে ডেকেই থাকে তাতে অন্যায় কি? এছাড়া এতে তো তার কোনো ক্ষতি হচ্ছেনা। এ ব্যাপারটা যতক্ষণ না জানাজানি হচ্ছে ততক্ষণ খারাপ কিছু ভাবতেই পারেনা সে। তিনচার দিন এ দৃশ্য দেখে সুশীলা সাড়া দিলো। এপাশ ওপাশ দেখে নিয়ে, নিজের মা-বাবা, আত্মীয় স্বজনের দৃষ্টি এড়িয়ে সে সত্যাই ঐ অট্টালিকার দিকে নিজের ডানহাতটা তুললো ছোট্ট করে। আবার ডান-বাঁ দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে খুললো মুঠোর পাপড়িকটা। পাঁচটা আঙুল পাপড়ীর মত কেঁপে উঠলো। সুশীলা হাতছানি দিয়ে ডাকলো ভাস্করণকে। আঙুলের কোনো ভাষা ছিল না কোন চিন্তা না করেই সে ইসারায় নিমন্ত্রণ জানালো। তারপর চিন্তা করলো! ছি! ছি! ছি! সে একি করলো? কি লজ্জা! কুমারী যুবতীর এধরনের ভুল কাজ করা কখনই উচিৎ হয় নি! এ মহা গর্হিত ও অন্যায় কাজ। এতে অপরাধ আছে। পাপও থাকতে পারে। এক জটিল প্রশ্ন জালে জড়িয়ে পড়ে সুশীলা আক্ষেপ ও আফশোষের আগুনে পুড়তে লাগলো।

পরের দিন সুশীলা মনকে শান্ত করেছে। সত্যাই তো, এই ডাকাডাকি খেলাতে অন্যায় কি থাকতে পারে। কেউ তো আর দেখছে না। জানাজানি হওয়াটা হয়তো দুঃখের হতে পারে।

তার হাতছানি দিয়ে কাউকে ডাকার অর্থ এই নয় যে আমি বন্দী, তুমি আমায় উদ্ধার করো, কিংবা পাহাড়ের উপরে যাওয়া আমার মানা, তুমিই বরং নীচে এসো। সুশীলা আর ভাবতে পারলো না! এই ধরনের ছেলেখেলা বা ছেলেমানুষীর পরিণাম এমন কিছুই হবে না যার জন্যে এত চিন্তা করতে হবে। পরাধীনা গ্রাম্য বালার কল্পনায়

আবেগে বাণ ডকলো। তাই সে পরপর তিনদিন স্পষ্ট ভাবে হাত তুলে আঙুল নেড়ে ডেকেছিলো ভাস্করণকে। নিজেকে সে বুঝিয়ে ছিল। চারিদিকের পরিবেশ এতটুকু বদল না করে সে প্রাণ খুলে সাড়া দিল। হাতছানি দিলো ভাস্করণ পাঁচবার। সে সাড়া দিলো একবার। তারপর মনে মনে মুচকি হাসলো। ন্যায় অন্যায়, লজ্জা ভয়ের ভাবনা তার একেবারেই কমে গিয়েছিলো।

সেদিন কালিকটের হাওয়ায় উঠলো আলোড়ন। এলো সারা মালাবার দেশে মালোয়ালীদের সেরা ও শ্রেষ্ঠ উৎসব। অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে সারা দেশকে আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দেবার জাঁকালো ব্যবস্থা, এর নাম ভীষু উৎসব। দেশ জননীর কোলে গড়ে ওঠা আবাল-বৃদ্ধদের এক মিষ্টি মজার দিন এটা। ঘন আঁধারের বুক চিরে পুড়বে লাখো লাখো বাজী। অন্য দেশের দেওয়ালীর বাজী, সারা বিশ্বের বাজীকে হার মানিয়ে কালিকট পোড়াবে কোটি কোটি টাকার রকমারী বাজী। নতুন পোষাক পরে আনন্দের জোয়ারে স্নান করবে সারা দেশবাসী। পরিবেশকে মনোরম করতে—চলবে মদ্যপান, সরবরাহ করা হবে শ্রেষ্ঠ খাবার আর বিলি হবে প্রেম, ভালবাসা ও বন্ধুত্ব। প্রতিটি মনের ব্যর্থতা, ক্রুরতা, ক্ষুদ্রতার হবে বনবাস। ঠিক এই মুহূর্তে মালোয়ালী ভাস্করণ নিজেকে ঐ পাহাড়ের মিলিটারীর হাজার বাধা ও বন্দীদশার মধ্যে আটকে রাখবে কি করে? পদ্মপাতায় জল টল্‌টল্‌ করে উঠলো। লোকে বলে ভীষু হচ্ছে দেবতাদের উল্লাস। মানুষের আনন্দ!

কল্পনাপ্রসূত এক দৃষ্টিকে সতেজ রেখে ভাস্করণ মনস্থির করে ফেলল। এই মধুমাখা শুভদিনে সারা দেশবাসী, সারা গ্রামবাসী যখন আনন্দ স্ফূর্তির উচ্ছ্বাসে নিজেদের ভাসিয়ে দেবে তখন সে কি করে নির্বাসিত আসামীর মত অট্টালিকার এক নির্জন কারাকক্ষে নিশ্চেষ্ট-তায় ও আলস্যে দিন কাটাবে! তাই ভাস্করণ ফন্দী ভাঁজলো এক মিনিটে। ফন্দীটাকে সাজিয়ে নিতে সময় লাগল কয়েক সেকেণ্ড। দুপুর বেলা সে যাবে পাহাড় ঘেঁষা ঐ গ্রামে। দু-পাঁচজনের সাথে

আলাপ সেরেই চলে আসবে। এমনটি না করলে সন্ধ্যায় সে তো অচেনা আগন্তুক বনে যাবে। তখন কেউ যদি তাকে পাত্তা না দেয়। সুন্দর চিন্তাধারা। দুপুরে হবে বন্ধুত্ব আর সন্ধ্যায় হবে ফূর্তি। সে নাচতে জানে, হাসতে জানে, মজার হুল্লোড়কে জীবন দিতে কিছু খরচাও করতে পারবে। এছাড়া হাতছানি পাওয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করার কাজটা-কিছুটা এগিয়ে রাখতে পারবে।

ভাস্করণ পোষাক পরলো। এমন পোষাককে সমর্থন জানাতে গ্রামের প্রতিটি জন হুমড়ি খেয়ে পড়বে। সেই সুযোগে সে সুশীলাকে নিজের পরিচয় দিয়ে আসবে। সে বার করলো মিলিটারী পয়সায় কেনা দামী গ্যাবাড়িন সুট-টাই-কোট। ফর্সা টুকটুকে নীরেট লম্বা চেহারাটা আয়নার সামনে ধরে নিজেই চমকে উঠলো। যেন সাহেবের বাচ্চা! গাঁয়ের মেয়ের চোখ ধাঁধিয়ে দেবে সে। পরিপাটি করে চুল আঁচড়ানো হোল। চোখে বিদেশী নীল চশমা। চকমকে পালিশ করা জুতো জোড়া, ভিতরে নাইলনের মোজা। চলার প্রতিটি পদক্ষেপে মিলিটারী-গাম্ভীর্য। এই পোষাকে সামনে দেখলে সুশীলা নিশ্চয়ই তাকে বসতে বলবে কিংবা,···অনেক কিছু ভাবলো সে। দুরবীনে ভুল দেখেনি তো। মুখে সলাজ হাসি, একদৃষ্টে চেয়ে থাকা, প্রত্যহ একই সময়ে নারকেল গাছতলায় দাঁড়ানো, হাতছানি দিয়ে ডাকা, নীরব ইঙ্গিত, সবব নিমন্ত্রণ। আজ সব সমস্যার সমাধান হবে। চাওয়া পাওয়ার হিসাব আজ মিটিয়ে ফেলবে ভাস্করণ!

পাহাড় থেকে গ্রামের পথে নামতে নামতে ভাস্করণ দুটো প্রশ্নের জটিল জালে জড়িয়ে পড়ল। অন্তরের গভীরতম প্রদেশের সূক্ষ্ম স্নায়ুগুলো হঠাৎ শিহরিত হোলো। মশা মারতে কামান দাগা নয়তো! এমন সাজে সে যে, ছন্দময় বেগে ছুটে চলেছে,—এই গতির শেষ কোথায়? সুশীলা কি সত্যই তাকে ডেকেছে? ডাকার অর্থ কি ভালবাসা?

সুশীলা সেইমাত্র নারকেল গাছটায় হেলান দিয়ে উপর দিকে চেয়েছে। পরনে অতি সাধারণ একটা ধুতি লুঙ্গীর আকারে জড়ানো,

গায়ে রঙচটা আটপৌরে একটা ব্লাউজ। সে এক দৃষ্টে খুঁজছিলো তার খেলার সাথীকে। তার ইচ্ছা হচ্ছিলো চীৎকার করে বলতে, আজ আর দূরে কেন? হঠাৎ এলো ভাস্করণ। যেন চোখ ধাঁধানো একঝলক সূর্য্য রশ্মি! যেন একতাল জলন্ত অগ্নিপিণ্ড! রাজপোষাক পরে এসেছে রাজাবাবু। চমকে উঠলো ঐ গ্রাম্যবালা। হল্ট! থমকে দাঁড়ালো মিলিটারী। মৃদু মিষ্টি হাসিভরা ঠোঁট ঈষৎ উন্মুক্ত, অপলক দৃষ্টি। সহজ বোধ্য ভাষায় ভাস্করণ বললো, আমি এসেছি। একেবারে চোখাচোখি। ক্ষণেক মাথানীচু করে দাঁড়ালো সুশীলা। ক্ষণেকের সিকিভাগ চিন্তা করলো। তারপর দ্রুত পদক্ষেপে উঠান পেরিয়ে ঢুকে পড়লো নিজের ঘরে। বাতাস গুণ্ডিয়ে উঠলো। নারকেল গাছটা একটু সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

বহুদিন তিলে তিলে যে মিষ্টি আশাকে কল্পনার মাঝে মিশিয়ে ভাস্করণ নিজের সামনে একটা ছবি এঁকেছে আজকের পরিস্থিতি তা যেন ছিন্নভিন্ন করে দিলো! দূরবীন কি তাহলে তার সাথে বিশ্বাস ঘাতকের মত ছলনা করেছে? কোন কথা না বলে সুশীলা চলে গেল কেন? যদি কিছু বলার না-ই-ই ছিল, কিছু শুনতে চাইল না কেন সে? —কেন? কেন?

এই ধরনের সাহেবী পোষাকে গ্রামে আসা উচিৎ হয় নি,—এ ভুল বড় মারাত্মক ভুল। এছাড়া তার এইভাবে উপযাচক হয়ে সুশীলার বাড়ী আসাটা সত্যই বাড়াবাড়ি হয়েছে। সে হঠাৎ এক অজানা অচেনা যুবতীর সামনে অমন অসভ্যের মত দরদভরা কণ্ঠে কেন বলতে গেল আমি এসেছি। তার সৌজন্য বোধের একান্ত অভাব। তাই উচিৎ অনুচিতের মাঝখানে নিজের বিবেককে বিচারক সাজিয়ে এবাউট টার্ণ, কুইক মার্চ শুরু করলো। এতটুকু সময় নষ্ট না করে সে খুব দ্রুত গতিতে নিজেকে টেনে নিয়ে চলল। গতি দ্রুত থেকে দ্রুততম হোলো। বহু আশা আকাঙ্ক্ষা ভরা মনটা মোচড় দিয়ে উঠলো। জীবনের প্রথম ভালবাসা যেন কঠিনভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তাকে ধিক্কার দিতে লাগলো। মিলিটারী ভিক্‌ট্রির বদলে পরাজয়

স্বীকার করে ছুটে চলেছে নিজের তাঁবুর দিকে। সান্ত্বনার একমাত্র স্থান পাহাড়ের চূড়ায় ঐ অট্টালিকা। সেখানে সে একরকম ছুটেই পৌঁছে গেল। একলাফে যেয়ে দাঁড়ালো বারান্দার কোণে। দূরবীনটা হাতে তুলে নিয়ে দৃষ্টিকে এঁটে দিলো ঐ উঠানের দিকে। ইস্! যদি মেয়েটার নামটাও জেনে আসতে পারতো! ভাস্করণ একটা বড় শ্বাস নিয়ে খুব সতর্ক দৃষ্টিতে দূরবীন ঘুরিয়ে চলল। সে স্পষ্ট দেখলো এক চিল্‌কে সোনালী রোদ বিদায় নিচ্ছে ঐ উঠান থেকে। ঐ রোদের মাঝেই দেখলো একটা রঙিন শাড়ী যেন উঠানের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ছোটাছুটি করছে। যেন কাউকে খুঁজছে। যেন কিছু একটা হারিয়ে ফেলার ছট্‌ফটানী! দূরবীন অন্ধ হয়ে আসছিলো। দৃষ্টিহীন বৃদ্ধদের কষ্ট করে বই পড়ার মত অতিকষ্টে দূরবীন্ স্থির করে দেখলো সুশীলা রঙিন শাড়ী পরে উঠান থেকে উপরে তাকিয়ে বারে বারে হাত নেড়ে মেঘনাদকে ডাকছে। সূর্য্য ডুবে এসেছিলো। ভাস্করণ যেন আশ্বাস পাচ্ছে, তাই আবার জোরে শ্বাস নিলো।

কিছুক্ষণ আগের ভুল বোঝাবুঝি মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। লুঙ্গী আকারে ধুতী জড়িয়ে সাদা হাফশার্ট এঁটে পাকা মালোয়ালীর সাজে পাহাড় থেকে আবার নেমে এলো ভাস্করণ। আঁধারের বুকচিরে পুড়ে চলেছে লাখো লাখো বাজী। হাউই, চকলেট বোমা, তুবড়ী, চরকী, দোদমা, আরো কত নামের বাজী কত রকমারী আওয়াজে ফাটছে, পুড়ছে, ধোঁয়া উড়াচ্ছে। খুব ধীর ও সাবলীল গতিতে এলো ভাস্করণ।—এলো সুশীলার উঠানে।

ভাস্করণ পা পা করে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো লাজে ভেঙ্গে পড়া সুশীলার সামনে। সুশীলা এখন তৈরী। দুপুরে ভাস্করণ সাহেব সেজে এসেছিলো। তখন সুশীলা তৈরী ছিল না। একছুটে ঘরে ঢুকে সে প্রথমেই বার করেছিলো ভীষু উৎসবে পরবার শাড়ীখানা। টেনে নিয়েছিলো গোলাপী শায়া আর কালো রঙের সিল্কের ব্লাউজ। শরীরের এগারোটা রেখায় মানানসই করে এঁটে নিলো ঐগুলো। ছড়োছড়ি পড়ে গেল সাজের। লাফালাফি, দাপাদাপি, ছুটোছুটী।

কাজ কিছু কিছু অসম্পূর্ণ রেখে সে টেনে নিয়েছিলো কুমকুম, কাজল, পাউডার আর কপালের টিপ। এগুলোর কাজ শেষ করে আবার কেশ বিন্যাস, চিরুণীর টান তারপর চোখেমুখে আয়না বোলানো। রাজাবাবু এসেছে তার বাড়ীতে। এ তার কম সৌভাগ্য! এতো মানুষ নয় যেন স্বয়ং দেবতা। এমন অতিথির সামনে একটু সাজতে হবে বৈকি! সোনাবাবুকে আপ্যায়ন জানাবে সে নিজে। ভীষুর উৎসব কতবার এসেছে কিন্তু আজ তার অন্য উৎসব। সুশীলা আয়নার উপর একটু হাসলো। মনটা তার অট্টহাসিতে মেতেছে। এবার একপল চিন্তা। তারপর এক অন্যপল আয়না দেখা। ইস্! দুটো ফুল পেলে সে চুলে গুঁজে দিতো। ঠোঁটটা লাল করেছে সিঁদুর দিয়ে। ব্যস্, শেষবার আয়না দেখা। তারপর সাজের সামগ্রী ছুঁড়ে ফেলা। মনের মানুষ যদি চলে যায়। আর দেরী নয়। সুশীলা একটানে বন্ধ দরজা খুলে ফেলল। লাফিয়ে নামলো উঠানে। হায়! জোয়ার কখন চলে গেছে—এখন ভাটা। উঠান ফাঁকা। সাহেব কোথায়, রাজা কোথায়, সোনাবাবু কোথা গেল! মনের মানুষ, খেলার সাথী এই ছিল, কোথায় গেল? একি স্বপ্ন না সত্য! সুশীলার মনের হাজার প্রশ্নের ঢেউ ছড়িয়ে পড়লো উঠানের সর্বপ্রান্তে। সে একি করল? অতিথি নারায়ণ। নারায়ণের অপমান বড় কু-লক্ষণ। সে এখন কি করবে? পাহাড়ের দিকে হঠাৎ একবার তাকিয়ে সুশীলা তাঁর কর্তব্য স্থির করে নিয়েছিল। তাই ডেকেছিলো শুধু ক্ষমা চাইতে। মহারাজ বড় দয়ালু। তার স্বপ্ন সত্যই সত্য।

এখন আরো একটু কাছে এসে ভাস্করণ প্রশ্ন করলো, তোমার নাম কি? কি সুন্দর সেজেছো তুমি। ঠিক যেন মা লক্ষ্মী।

এক হাতের নখ দিয়ে অন্য হাতের নখ ধরলো সুশীলা। সারা উঠান ফাঁকা। সুশীলার বাড়ীও ফাঁকা। উৎসবে সকলেই বেরিয়েছে। প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে ঘাড় উঁচু করে চোখের দৃষ্টিকে বড় করে একবার তাকালো। যেন ভারত নাট্যম্ নাচের অঙ্গভঙ্গী। আবার মাথা ঝুঁকিয়ে দিলো লজ্জায়।

—পাহাড়ের উপর থেকে রোজ তোমায় দেখি। কত সুন্দর তুমি। ভেবেছি এসে আলাপ করি। ভয় হয়েছে যদি কথা না কও, সাড়া না দাও, যদি মুখ ঘুরিয়ে চলে যাও! দুপুরে অমন করে চলে গেলে কেন? বলবে না তো তোমার নাম?—তাহলে চলে যাই।

হৃদয় জোড়া খুসীর আমেজ। বাণের জল পাড়ে এসে ঠিক এমনি করে ছটফট্ করে। সুশীলার ঠোঁটে কাঁপুনী উঠলো। বললো, আমার নাম সুশীলা। আপনার নাম?

—ভাস্করণ। আমার বাড়ী কোচিন। কাজ করি মিলিটারীতে। এখানে এসেছি মাত্র একমাস। তোমায় একদিন দুষ্টুমি করে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিলাম। তখন কিন্তু একবারও ভাবিনি কিছু। আজ তোমায় কাছে পেয়ে আমি ধন্য! বিশ্বাস করো সুশীলা, আজকাল দিনে রাতে তোমার কথা ভীষণ ভাবি। আমি তোমায় ভালবাসি সুশীলা। এতটুকু মিথ্যা বলছি না। ভীষু উৎসবের নামে শপথ করে বলছি তুমি ভিন্ন আজ আমার আর কেউ নেই। শোনো, সুশীলা তুমি আজ শুধু শুনে যাও।—ভাস্করণ ঐ গ্রাম্য ময়ূরীর সামনে ময়ূর-নৃত্য শুরু করলো। ময়ূরের পেখমের গাঢ় রং জ্বলজ্বল করে উঠলো। সাহস, আবেগ আর স্পষ্ট অভিব্যক্তির মালা গেঁথে ভাস্করণ সুশীলাকে সাজাতে লাগল।

গাছে গাছে মোমবাতির টিমটিমে শতমুখি আলো ঐ গ্রামটাকে যেন সুশীলার মতই রূপবতী করে তুলেছে। নানা সাজে সেজেছে ছেলে বুড়ো, নাতি নাতনী আর ঠাকুমা দিদিমা। আমোদের নানা ঢঙে মেতেছে ধোপা, নাপিত, কুমোর জেলেরা।

ভাস্করণ আরো কাছে এসে সুশীলার হাত ধরলো। প্রশ্ন করলো, আমায় ডেকেছো কেন বললে না তো!

—জানি না!—মৃদু জড়ানো উত্তর।

—কি জানো তাহলে? তোমার মনের কথা, অন্তরের ভাষা আমি বুঝি সুশীলা। এসো, কাছে এসো। ভাস্করণ ছুঁই ছুঁই করে আবার ময়ূর নৃত্য শুরু করলো! কোনো ভীষু উৎসবে এমন করে

নাচেনি সে ! পাশেই একটা বড় তুবড়ী নিজের সমস্ত অস্তিত্ব জাহির করে নিস্তেজ হয়ে গেল। ভাস্করণ হঠাৎ নৃত্য থামিয়ে দিলো।

সুশীলা ভয়ার্ত কণ্ঠে গুঙিয়ে উঠলো। তার সারা শরীরটাকে কঠিনভাবে পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরে যেন এক ভয়ঙ্কর বিষাক্ত সাপ ফণা দুলিয়ে তার চোখে, মুখে, বুকে বারে বারে দংশন করছিলো। সারা শরীরে সে তীব্র জ্বালা অনুভব করলো। অন্তরে এলো বিবেকের দংশন। এমন একটা ঘটনার জন্যে সে একবারও চিন্তা করেনি। সারা উঠানে বইতে লাগলো উত্তাল ঝোড়ো হাওয়া। সুশীলার দম বন্ধ হবার উপক্রম হোলো। আপ্রাণ চেষ্টায় কোনোভাবে সাপেব বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে লাগলো। সুশীলার চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি। সারা উঠানটায় হাঁফানীর শব্দ। সারা শরীর জুড়ে লড়াই-এর এলোমেলো চিহ্ন! হাঁফাতে হাঁফাতে সুশীলা বললো, শয়তান! দূর হও। চলে যাও।

পোষমানা সাপটা ফণা তুলে আবার এগিয়ে এলো, সুশীলার কোমরটায় পাক দিতে দিতে বললো, এসো আজ মেতে উঠি। এমন মিষ্টি উৎসবের দিনে আর দূরে কেন ? তুমি একমাত্র আমার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছো। তুমি আর আমি, তোমার সুখ আর আমার আমিত্ব সবই আজ একাকার করে দাও। বিশ্বাস করো আমি তোমায় ভালবাসি। এসো, আরো কাছে এসো।

না, না, না। কথার শেষ প্রান্তে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি মেরে সাপটাকে অনেক দূরে ছুঁড়ে দিলো সুশীলা তারপর একছুটে ঘরে ঢুকে সজোরে ও সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে হুস্ করে ছেড়ে দিলো এতক্ষণ আটকে থাকা হাঁফটুকু। ছি! ছি! ছি! কেন মরতে সে হাতছানি দিতে গিয়েছিলো!

সাপটা এবার একটু থমকে দাঁড়ালো। এগিয়ে গেল টলতে টলতে। মিলিটারীর ভয়ডর কম। করব কিংবা মরব এই তার পণ। দরজায় তিনটে টোকা মারলো। বন্ধ দরজা আরো জোরে বন্ধ হোলো। লজ্জা ঘেন্নার মাথা খেয়ে সাপটা ইনিয়ে বিনিয়ে বলল, ভুল বুঝোনা।

—আমি যে কি তা তুমি বুঝলে না। আমি তোমায় চাই। দরজা কতদিন বন্ধ রাখবে? কাল সকালে আমি তোমার বাবার কাছে আসব। টা-টা! বা-ই-ই।

দরজার কাঠ তক্তা নিরুত্তর। জড় পদার্থ যেন আজ মস্ত চেতনা পেয়ে অভিমান করেছে।

আবার মিলিটারীর কণ্ঠস্বর।—আমি শেষ কথাটুকু বলতে এসেছি। সুশীলা, ডারলিং, দরজাটা এক মুহূর্তের জন্য খোলো।

দরজা তপস্যায় বসেছে। এখন কথা কইতে নেই।

—খুলবে না দরজা? তুমি কি আমায় পছন্দ করোনা, আমায় তুমি কি ভালবাস না?—অমন করে ডেকেছিলে কেন তাহলে?

দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে সুশীলা তখন বোধহয় কাঁদছিলো। দুটো পোষা বিড়াল ওর পায়ের কাছে লুটোপুটি খাচ্ছিলো।

আরো এক মুহূর্ত অপেক্ষা। তারপর বুকে হেঁটে সাপটা এলো গ্রামের বাইরে। হাজার প্রশ্নে বাজী পোড়ানোর আলোময় বাতাস যেন ভারী হয়ে উঠলো। এই ভীষু উৎসব মুখর গ্রামের মুক্ত বাতাসে সকলে যখন আপন আপন সত্তার পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছে, তখন এ কি ব্যাপার? সুশীলাটা ভীতু। গেঁয়ো তো!—কিসের ভয়?—এমন সংশয়বোধ কোন কারণে? —বাধাই বা কোথায়?

এক যুবতীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে এক যুবক যখন মনে প্রাণে তৈরী হয়ে দু'পা এগিয়ে···তখন উঃ! কি অপমান! কি জ্বালা! তার দোষটা কোথায়? তার কোনো অন্যায় হয়েছে কি? আজ সে-ই বা এত ক্লান্ত কেন? চারিদিকের ঝলমলে আলো যখন সারা বিশ্ববাসীকে নতুন পথের সন্ধান দিচ্ছে তখন পুরোনো রুচিবোধ, সামাজিক পচা আদবকায়দা, মান্ধাতা আমলের লজ্জাবোধ নিয়ে সুশীলা কেন বেঁচে থাকতে চায়? আজ পাহাড়ে ওঠার পথের আলোগুলো নিভু নিভু হয়ে তাকে ভেংচী কাটছে কেন? এতটুকু পথ আজ হঠাৎ যেন দশগুণ বেড়ে গেছে। টলতে টলতে হোঁচট খেতে খেতে সাপটা অট্টালিকার পাশে এসে দাঁড়ালো। ওয়েষ্ট হিল আজ বোবা। অট্টালিকার দেওয়ালগুলো মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে। ঘরের খাট বিছানায় যেন আগুন জ্বলছে। দূরবীনটা আজ অন্ধ হয়ে ঘরের এক কোণে ঝিমোচ্ছে। সাপটার দুটো চোখে যেন দু'ফোঁটা কান্না চক্ চক্ করছিলো।

এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট

শ্রীরামপুর ষ্টেশনের কাছেই তিন নম্বর বাস ষ্টপ্।

বেশ আগে থেকেই সিট দখল করে বসেছেন বৃদ্ধ বঙ্কিমবাবু। আধখানা মাথা ভরা পাকা চুল। বাকীটায় টাক। ভ্রূ-র সব চুল পাকা। চক্ষু কোটরাগত। পাশেই বসেছে এক যুবক, নাম তপন। পেট ঠাসা বাসের প্যাসেঞ্জার দাঁড়িয়েছে নানা ভঙ্গিমায়। বঙ্কিমবাবু বললেন, স্বাধীন দেশের বাসের হাল দেখো। এ যেন স্বেচ্ছায় অর্থ-ব্যয় ক'রে জেলখানায় ঢোকা।

তেইশ বছরের ছেলে তপন বলল, দুধ সুধা না হয়ে গরল হ'লে যা হয়।

কথাটি লুফে নিয়ে বৃদ্ধ বললেন, ঠিক বলেছো ভাই। যাবে কত দূর? তুমি তো লাখ টাকা দামের কথা বললে হে। আমাদের যুগে কিন্তু এমনটি ছিল না।

সব যুগেই ছিল, তবে কম বেশী। আপনাদের সময়ে দেশে লোক ছিল ক'জন?

—সে কথা অবশ্য ঠিক। তখনকার দিনে পাঁচ কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ বর্গমাইল ভূভাগে বা সারা বিশ্বে লোক ছিল মাত্র তিরাশী কোটি; আর এখন শুধু ভারতেরই লোক সংখ্যা প্রায় আশি কোটি। সেকালে সমস্যা ছিল অল্প, কিন্তু স্বাচ্ছন্দ ছিল কত বেশী। নদী ভরা ছিল জল, গাভীর বাট ভরা থাকতো দুধ, মাঠে মাঠে ছিল ফসলের বাহার···।

—কতদূর যাবে বললে তুমি?

—কলকাতায়—বাগবাজারে। লাষ্ট ষ্টপ।—আপনি কোথায় যাবেন?

—আমিও যাব বাগবাজার। কোথায় এসেছিলে?—এখানে বুঝি বাড়ী তোমাদের?

—মাহেশে বাড়ী, বাগবাজারে মামার বাড়ী।

—মাহেশে বাড়ী? বা! পুরীধামের পরেই মাহেশের রথের খ্যাতি। এটা হ'চ্ছে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম পাট।

দ্বাদশ গোপাল কথাটা শুনেছি অনেকবার, কিন্তু মানেটা বুঝিনি ঠিক—বলল তপন।

এ আর বড় কথা কি? চৈতন্যদেব বারোজন ভক্ত নিয়ে নীলাচলে চলেছিলেন। এই বারোজনকে এক একটি কাজের দায়িত্ব দিয়ে সেই স্থানে রেখে তিনি একাই পুরীধামে যান। সমাজে এই বারোজন বৈষ্ণব দ্বাদশ গোপাল নামে খ্যাত। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে জগন্নাথ পুরীধাম থেকে এই মাহেশে এসেছিলেন গঙ্গাস্নান করতে। তাই তো মাহেশের স্নান যাত্রা আর রথযাত্রা দুটিই সেরা উৎসব।

—আপনার বাড়ী কোথায় দাদু? প্রশ্ন করলো এক দাঁড়ানো যাত্রী।

—বাঁশবেড়িয়া থেকে মাইল ছয় দূরে এক গ্রামে। ষ্টেশনের নাম বংশবাটী। এক সময় প্রচুর বাঁশঝাড় ছিল বলে ঐস্থানের ঐ নাম। বাঁশবেড়িয়ায় আছে হংসেশ্বরীর মন্দির। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজা নরসিংহ দেবরায় পনেরো বছরের চেষ্টায় পাঁচলক্ষ টাকা ব্যয়ে এই মন্দির তৈরী করান। এত সুন্দর ছ-তলা মন্দির বাংলায় আর কোথাও পাবে না। শিবের নাভি থেকে ওঠা ফোঁটা-পদ্মের উপর দেবী হংসেশ্বরী বসে আছেন। দেবী দারুময়ী, ত্রিনেত্রা, চতুর্ভুজা, নীলবর্ণা।

—আপনি তো হুগলীর বহু খবর রাখেন দেখছি।

—তা রাখব না? হুগলীতে জন্ম, এইখানেই মানুষ, আবার কর্মজীবনও কেটেছে এইখানেই। এই যে শ্রীরামপুর থেকে বাস ছাড়লো, এই শ্রীরামপুর হচ্ছে আধুনিক বাংলার সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সূতিকাগার।

—আপনার শ্বশুরবাড়ী কোথায় দাছ ? প্রশ্ন এলো বাসের অপর এক কোণ থেকে।

—তারকেশ্বরে। যেখানে দুধ পুকুরে স্নান করলে সকলের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। ঐ তারকনাথের কৃপায় বহু লোক দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করে।

—তারকেশ্বরের ইতিহাস একটু বলবেন কি ? মানে ট্রু পিক্চারটা।

—ট্রু পিক্চার চাও ? বেশ শোনো। বর্তমান মন্দিরটার স্থানে আগে ছিল নল-খাগড়ার বহু গাছ। গাছভরা ঐ নাবাল জমিটায় ছিল এক অদ্ভুত শিলা খণ্ড। হরিপালের কাছে রামনগরের রাজা বিষ্ণুদাসের গোশালা ছিল তারকেশ্বরের কাছে। ঐ গোশালায় অনেক গরু ঐ শিলাখণ্ডের উপর বাঁট থেকে দুধ ঝরিয়ে দিত। গো-রক্ষক মুকুন্দরাম এই ব্যাপারটা রাজাকে জানালো। রাজা এখানে একটি মন্দির তৈরী ক'রে দিয়ে মুকুন্দরামকে ঐ শিলারূপী শিব সেবার ভার দিলেন।

—আপনি সত্যই জিনিয়াস। বললো একটি ছেলে।

—জিনিয়াস নয় ভায়া, খবর রাখতে হয়। আমি হুগলী জেলাকে ভালবাসি। একমাত্র এই জেলার বাসিন্দাদের মধ্যে আছে প্রবল ভ্রাতৃত্বভাব, কঠোর উদ্যম আর জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য তেজ। এ জেলার জনগণ যেমন সহজ-সরল, তেমনি উদার। এই দেশের উপর দিয়ে গঙ্গার স্রোত যেন সব কিছুকেই পবিত্র করে তুলেছে। সেই ছড়া শোনোনি ?

"নগর ঘোষকে দূরে রেখে গুপ্তিপাড়ার রথটি দেখে
ফিরবে সবে বাড়ী।
ঠিক মিটাবে মনস্কাম খানাকুলের কাশীধাম
ধনেখালির শাড়ী।"

ঐ যে নগর ঘোষ। গৃহশত্রু—মানে মীরজাফর। পাণ্ডুয়ায় ছিল পাণ্ডু রাজার রাজত্ব। ঐ রাজ্যে ছিল একটা কুণ্ড বা জলাশয়। ঐ জল স্পর্শ করলে মৃত সৈনিক জীবন লাভ করতো। তাই মুসলমান

রাজারা কিছুতেই এই রাজাকে জব্দ করতে পারেনি। ঐ নগর ঘোষ যোগীবেশে অন্তঃপুরে ঢুকলো। অর্থ লোভে সে হিন্দুদের সর্বনাশ করতে ঐ জলে নিষিদ্ধ মাংস ফেলে কুণ্ডের মাহাত্ম্য নষ্ট ক'রে দিয়েছিলো।

—গুপ্তি পাড়ার রথে কি আছে? খানাকুলকে কাশীধাম বলে কেন দাদু? একজন যাত্রী শুধালো।

—গুপ্তিপাড়ার রথ হ'চ্ছে বাংলার সর্ব্বোচ্চ রথ। আর খানাকুলের খবর জানো না? দ্বাদশ গোপালের প্রথম জন অভিরাম গোস্বামী এখানে আবির্ভূত হন। সুবিখ্যাত পণ্ডিতদের সাধনায় ঐ স্থান ছিল ধন্য। ঐখানে শ্মশান কালী, অন্নপূর্ণা, ধর্মঠাকুর, ক্ষুদিরাম, গৌর নিতাই প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন মন্দির আছে বলে এই স্থানকে বলে বাংলার কাশীধাম। এছাড়া বাংলায় একমাত্র ঐখানে ব্রাহ্মণ ও অ-ব্রাহ্মণদের পোড়াবার জন্য আলাদা শ্মশান আছে।

—আপনি এখানে কোথায় এসেছিলেন? প্রশ্ন করলো তপন?

—এসেছিলাম আমার ছোট্ট বাগান বাড়ীতে। সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে চলে আসি। এটা সেটা নিয়ে ফিরি। মানে টাইম পাস করি।

—বাড়ীতে কে আছে আপনার?—ছেলেমেয়েরা কেউ আসে না? প্রশ্ন করলো এক যাত্রী।

—আছে সকলেই, আবার কেউ নেই। বড় ছেলে ফ্যামিলি নিয়ে থাকে ত্রিবেণী। ত্রিবেণী অর্থে তিনটি নদীর সঙ্গম নয়। এ জিনিষ ভারতের কোথাও নেই। প্রয়াগে যেমন গঙ্গার সাথে যমুনা মিলেছে তেমনি ত্রিবেণীতে গঙ্গা থেকে সরস্বতী নদী বেরিয়েছে।

—সাথে মাসীমাকে আনেন নি কেন? একদিক থেকে প্রশ্ন এলো।—না, সে আমার সাথে আসে না।

—কি করেই বা আসবে? আপনি পুরুষ মানুষ, তবু ঠেলাঠেলি করে আসা যাওয়া করেন, কিন্তু বৃদ্ধাদের পক্ষে—

—যাত্রীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বঙ্কিমবাবু বললেন, না, আমার স্ত্রী বৃদ্ধা নয়। তার বয়স খুবই কম,—মানে যুবতী। এই কারণেই আমার সাথে বেরুতে সে একটু কিন্তু বোধ করে। হঠাৎ প্রসঙ্গটা পাল্টে তিনি বললেন,—এই যে দাদা, রডের ঐখানটা ধরবেন না। গাড়ী ব্রেক করলে হাত চিমটে যাবে।—এই যে ভাই কণ্ডাক্টর, টিকিটটা দাও। —ঐ দেখো, গেটটা ওরা জ্যাম করবেই। —ভিতরে এসোনা। এরা ডিসিপ্লিন বলে কিছু জানে না। শিক্ষা দীক্ষা সব লোপ পেয়েছে।

—শিক্ষা বলে আর কিছু আছে নাকি? এখন তো সবই রাজনীতি। সহজভাবে বললেন কাছাকাছি বসা এক প্রৌঢ়।

বঙ্কিমবাবু বেশ ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন, শিক্ষার আসল অর্থই এরা বোঝে না। শিক্ষার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে স্বচ্ছন্দ গতি, মুক্ত প্রাণ আর নিয়ম শৃঙ্খলা। কি দেখেছিলাম আর কী দেখছি। সবকিছুই ওলট পালট। সর্ব স্তরেই এসেছে ধ্বংস। ঐ দেখো মহিলাদের সীটের ওপর ঝুঁকে পড়েছে মোহমুগ্ধ একদল যুবক। আমাদের যুগে এমনটি ছিল না, ছিল প্রাণঢালা উৎসাহ আর অফুরন্ত জ্ঞান পিপাসা। —বলো মিথ্যা বলছি?

—এটা যুগের পরিবর্তন। এর জন্যে দায়ী কে? এক যাত্রী প্রশ্ন করলো।

—কেউ নয়। কে আবার দায়ী? সবই একটা নার্ভাস সিস্টেম। সেই দেশ, সেই হাওয়া, সেই জল এমন কি সেই ঘরবাড়ী এখনও সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ, রোগ, জ্বালা, সুখ, দুঃখ আর অনুভূতি কেউ আমাদের ছেড়ে যায়নি; শুধু মস্তিষ্কের ভিতরে অবস্থিত সুষুম্না কাণ্ডের মাঝে ঘটেছে আলোড়ন আর মারাত্মক অঘটন। তাই এই কাণ্ড দিয়ে মস্তিষ্কের সব খবর সারা শরীরে ঠিকভাবে বহনাবহন হচ্ছে না। সেই কারণই এনেছে এযুগে মস্ত গোলমাল আর নোংরা অশান্তি। এছাড়া এই বাঙালীর বুদ্ধি কর্মক্ষমতা এবং সচেতনতা একদিন ছিল সকলের চেয়ে ওপরে কিন্তু

আজ দুর্নীতি, অব্যবস্থা, অপদার্থতার গ্রাসে ও ফাঁসে তারা ধ্বংস, বন্দী।

—আর কোন ছেলে নেই আপনার? আবার প্রশ্ন এলো।

—আছে। দুটি ছেলের ছোটটি আছে খুব কাছেই। চন্দন নগরে। জগদ্ধাত্রী, বিশালাক্ষী দেবীর পূজা এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। বাংলার ধর্মবিপ্লব হয়েছে এই চন্দননগরে।

—আপনার বয়স কত হোলো দাদু? প্রশ্ন করলো এক নাতি।

—একাত্তর। দশদিন পরেই হবে সেভেনটি টু।

—চলা ফেরায় আপনার কোন অসুবিধা হয় না?

—নো। দাঁত, চোখ, হার্ট, লিভার, কিড্‌নী বেশ ভালভাবেই কাজ করে যাচ্ছে। বোধ শক্তি এখনো বেশ প্রখর। চলার গতিও দুরন্ত। চরিত্রে উদারতা, ভক্তিতে গাম্ভীর্য আর হৃদয় প্রেমপূর্ণ রেখে নিজেও আনন্দ পাই আবার অপরকেও মুগ্ধ করার চেষ্টা করি।

—শোক, দুঃখ, হতাশায় ভোগেন নি কখনও? ঝুঁকে পড়া একজন জানতে চাইল।

—নো-ও-ও।—কোথায় এলাম যেন? খটিকবাজার না?

হ্যাঁ, কি বললে—শোক হতাশা? না। জ্ঞানীরা মৃত বা জীবিতের জন্য শোক করে না। একটা কথা কি জানো ভাই, আমাদের মরণ নেই, বিচ্ছেদ নেই তাই দুঃখ নেই। এই পৃথিবীর মাঝে প্রকৃতির এক মনোরম নাট্যগৃহে আমরা হাসিকান্নার অভিনয় করে চলেছি। শত্রু মিত্র সেজে জয়পরাজয় খেলছি, প্রেম বিরহ ও কলহের রসপান করছি মহা-আনন্দে। হতাশা আসবে কেন? বাল্যকাল গত হয়েছে তার জন্যে কাঁদিনি, যৌবন ছেড়ে চলে গেছে— কোনো আফশোষ করিনি, এখন হয়েছি বৃদ্ধ।—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে লাভ কি? প্রকৃতির নিয়মে একদিন মৃত্যু আসবে, আবার আসবে জন্ম। স্রোতের মৃদু তরঙ্গের সাথে এগিয়ে আসবে জীবনের প্রতিটি স্তর, তারপর হাজির হবে মৃত্যু। এটা চলেছে, চলছে, চলবে।

আরে ভায়া, আমরা তো চলে যাচ্ছি না। আমরা আছি, ছিলাম আবার থাকবো।

—উঃ! দাদু! আবার আধ্যাত্মিক কথাবার্তা শুরু করলেন!

তপনের স্বরের উপর একপর্দা বাড়িয়ে দাদু স্পষ্ট বললেন, আধ্যাত্মিক নয়, বাস্তবের কথাই বলছি। সব সত্যই বলছি। তবে বয়সের ভার বলে একটা ব্যাপার আছে। মানে কি জানো? হাঁচি পেয়েছে অথচ হাঁচি ফস্কে গেল—আমার এখন সেই অবস্থা। কথা শেষ করেই দাদু একটু নস্য নিলেন। তারপর বাইরেটা দেখলেন। সামান্য সন্দেহ প্রকাশ করে শুধালেন, কোথায় এলাম! ওহো, বাঁশতলা।

—আপনি কি বিজনেস করেন দাদু? কে যেন শুধালো।

—না-রে ভাই, আমি কিছুই করি না। আমি হচ্ছি রিটায়ার্ড পুলিশের দারোগা।—কৈ গো কণ্ডাক্টর খুচরোটা ফেরৎ দাও?

—বৌদির বয়স যে কম বললেন, উনি আপনার দ্বিতীয় পক্ষ নাকি? একটি যুবক বসতে বসতে প্রশ্ন করলো।

—ইয়েস্, মানে তৃতীয় পক্ষও বলতে পারো।

—আপনার মেয়ে নেই?

—আমার দু মেয়ে। বড়টির বিয়ে দিয়েছি চুঁচুড়ার ইমামবাড়ার কাছে। প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ হাজী মহম্মদ মহসীনের পবিত্র সমাধি ক্ষেত্রে। শুধু বাঙালী তথা ভারতবাসীর নয়, সারা বিশ্ববাসীর দর্শনীয় স্থান। আঠারো শ' একষট্টি সালে মহসীনের ফাণ্ড থেকে প্রায় এক কোটি টাকা খরচ করে কুড়ি বছরের চেষ্টায় ঐ সুরম্য প্রাসাদ তৈরী করা হয়।—তোমরা সকলে দেখেছো ইমামবাড়া?

—অনেকেই সমস্বরে বলল, দেখেছি।

একজন প্রশ্ন করলো, আচ্ছা দাদু ভাগীরথীর তীরে পাশাপাশি ছ'টা সমাধি আছে ঐ প্রাসাদের ভিতর দিকটায়। ওগুলো কাদের সমাধি বলতে পারেন?

—পারি। বাসের টিকিট আর খুচরো পয়সা সযত্নে পকেটে

ঢুকিয়ে দাছু একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, ওরা হচ্ছে হাজী মহম্মদ, দ্বিতীয় জন তার ভগ্নীপতি সালাউদ্দিন খাঁ, তৃতীয়জন হাজীর বোন মুন্নু বেগম। শেষ তিনজন হচ্ছে হাজীর মা জনাব বেগম, পিতা আগ মহম্মদ মুতাহার আর শেষ সমাধি হচ্ছে হাজীর গুরুদেব কামালুদ্দিনের। কি মনোমুগ্ধকর মনোরম দৃশ্য! যেন মনে হয় ঐ ছায়া ভরা বাগানে শ্বেত পাথরে গাঁথা সমাধিতে ছ'জন পাশাপাশি শুয়ে আছে। চুঁচুড়ায় আমি ছিলাম বহুবছর। ঐখানে দিগম্বর হালদারের প্রতিষ্ঠা করা ষণ্ডেশ্বর শিবের মন্দিরটাও খুব প্রসিদ্ধ। চৈত্র সংক্রান্তির ছু'দিন আগে থেকে শিবের বিয়ে দেখার জন্য ঐখানে প্রতি রাত্রে কি ভীড়ই না হয়।

—ছোট মেয়ের কোথায় বিয়ে দিলেন? তপন জানতে চাইলো।

—কামার পুকুর। শ্রীরামকৃষ্ণ মানে গদাধরের গ্রাম। জীবে দয়া ছিল গদাধর জননীর চরিত্রের উজ্জ্বল ভূষণ। রামকৃষ্ণের পিতৃদেব ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভিটেমাটি বিক্রী করে দিলেন এক কুখ্যাত অত্যাচারী জমিদার। তিনি চেয়েছিলেন ক্ষুদিরাম মহাশয় তার হ'য়ে একটা মিথ্যা সাক্ষী দিক। তাতে রাজী না হওয়ায়, জমিদারের অন্যায় আব্দারে সাড়া না দেবার জন্যই এই শাস্তি। ছোট জামাইটি অবশ্য ব্যবসা করে ব্যাণ্ডেলে। থাকেও সেখানে।

—আচ্ছা দাছু, ব্যাণ্ডেলের চার্চটি কে তৈরী করেছিলো?

—তা জানিনা, তবে শুনেছি ঐ গির্জা তৈরী হয়েছিলো ষোলো শ' শতাব্দীতে। এটি হচ্ছে বাংলার সবচেয়ে পুরানো উপাসনা মন্দির। মনোবাঞ্ছা পুরণকারিণী এবং রোগমুক্তিদায়িনী জীবন্ত মেরীমাতা রোমান ক্যাথলিকদের খুব প্রিয়। এই মেরীমায়ের মূর্তির মত এমন অপরূপ মূর্তি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। আবার নস্য টানলেন দাছু। ঘাড় বাড়িয়ে বললেন, হিন্দমোটর স্টপেজ গেল না? এবার আসছে ডি. ওয়াল্ডি।

বাস বেশ তেজেই চলছিলো, হঠাৎ আগুন আগুন চিৎকারে বাসযাত্রীরা হৈ চৈ বাঁধিয়ে তুললো।

ঘটনাটা খুব ভয়ঙ্কর না হ'লেও অনেকে ভয়ে দিশাহারা হ'য়ে ছুটোছুটি শুরু করলো। আগুন শব্দটা ভয়ের হ'লেও এ ব্যাপারটি তেমন গুরুতর ছিলনা।

জনৈক অবাঙালী বৃদ্ধ একটা প্লাসটিকের ডাব্বায় ক'রে কেরোসিন নিয়ে বাসে উঠেছিল। প্লাসটিকের একস্থানে সামান্য লিক থাকায় সেখান দিয়ে তেল বেরোচ্ছিল। সে একটি দেশলাই জ্বেলে ভেবেছিলো লিক বন্ধ করবে। লিক হওয়া স্থানটা সামান্য গরম করলে ঐ প্লাসটিক একটু গলে ঠিক লিকটার উপর এসে জমবে।

বেচারা বৃদ্ধ। অগ্নিদেবতা তার চেষ্টায় বাধ সাধলো। স্ত্রীকে দূরে রেখে শালীকে প্রেম নিবেদন করার মত ব্যাপারটা প্লাসটিক ভেদ করে আগুন পোঁছালো তেলের কাছে।

যাইহোক, কোন্ননগর বাজারের কাছে বাস থামিয়ে হাঙ্গামার আসল কারণ ঐ প্রজ্জ্বলিত ডাব্বাটিকে সাবধানে রাস্তায় ফেলে দিয়ে বৃদ্ধকে নামিয়ে দেওয়া হল। বিপদ কাটলো সত্য, কিন্তু সবচেয়ে বড় ক্ষতি যা হোলো—তা হচ্ছে দাতুর তৈরী গল্পের উপর পূর্ণছেদ। হৈ-চৈ, লাফালাফি, চেঁচামেচি থামতে বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগলেও, একদল নাতি দাতুকে আবার ঘিরে ধরলো।

এক নাতি প্রশ্ন ছুঁড়লো, তৃতীয় পক্ষ মানে?

দাতু ধীরে বললেন, ব্যাপারটা কি হোলো জানো—হিন্দুশাস্ত্রমতে স্ত্রী মরলে—মৃতা স্ত্রী আবার জন্ম নেয়। কিন্তু বেঁচে থাকা ঐ বিপত্নীক স্বামীটির কি তুর্ভোগ বলো। বড় ব্যথা পেলাম। জানতাম ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য কিন্তু এ কোন্ ধরণের মঙ্গল? আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করি সুখ, সম্পদ, বিলাস, আরাম আর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। আমরা কিন্তু মৃত্যু চাইনা। হয়তো বলবে, কে মরে? কে মারে? ব্যথা পেয়েছিলাম—যখন আমার প্রথমা স্ত্রী মারা গেল অ্যাক্সিডেণ্টে মানে অপঘাতে।

—কি হয়েছিল দিদিমার?

—কিচ্ছু হয়নি। কুম্ভমেলায় গিয়েছিলাম। আমি ফিরলাম কিন্তু

ভীড়ের মধ্যে সে পড়ে গেল। যখন খুঁজে পেলাম—তাকে চেনা গেলনা। মানুষের পায়ের চাপে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। কিছুই করার ছিলনা ভাই। ছেলেমেয়েরা তখন স্কুল কলেজে পড়ে। সুখের মত দুঃখকেও সাগ্রহে গ্রহণ করলাম। তখন আমার বয়স পঁয়তাল্লিশ। পুনর্বিবাহের প্রয়োজনও যেমন ছিল তেমনি ছিল অনিচ্ছা। বারোটা বছর একাই হাল ধরলাম। মেয়ে দুটোর বিয়ে দিলাম। ছেলেদুটোর চাকরীর ব্যবস্থা করে তাদেরও বিয়ে দিলাম। চাকরী স্থলে অন্যত্র যেতে হোলো তাদের। বাড়ী ফাঁকা। আমি একা। অর্থের অনটন ছিল না। স্বাস্থ্যও ছিল অটুট। অনেকের নানা আপত্তি এড়িয়ে শেষকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মরণাপন্ন হলাম।···কোথায় এলাম যেন? বালী খাল।

—আপনি মনে হয় বিধবা বিবাহ করলেন?

—ইয়েস, ঠিক বলেছ। তখন আমার বয়স সাতান্ন। গিন্নীর বয়স একান্ন। সাথী পেলাম। মানে ভালই হোলো। আর একা থাকতে হোল না।

—ছেলে মেয়েরা বাধা দিল না বিয়েতে?

—নো-ও-ও। তারা দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিলো। আমার অসুবিধা তারা বুঝতো। আমি তো অনেক আগেই বিয়ে করতে পারতাম। তখনই বাধা দেবার প্রশ্ন উঠতো।

—নতুন দিদিমাও কি হুগলীর বাসিন্দা?

—নিশ্চয়ই। তার বাড়ী আদি সপ্তগ্রাম। হাওড়া থেকে সাতাশ মাইল দূরে বৈষ্ণব প্রধান এই গ্রাম। বৈষ্ণবজগতে উল্লেখযোগ্য সুবিখ্যাত উদ্ধারণ দত্ত ঐ গ্রামেই জন্মেছিলেন। বিপুল ঐশ্বর্যের এবং সম্পত্তির মালিক হ'য়েও তিনি রাতারাতি সব কিছুর মোহ ত্যাগ করে বৈষ্ণব হলেন। শোনা যায় নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ঐ ভক্তের গৃহে কিছুদিন বাস করেছিলেন।

গল্প বেশ জমেছে। বাসের হর্ণ বাজানোর শব্দ মাঝে মাঝে বিরক্তি আনছিলো। হুগলী জেলার সাদা ধূলো সারা বাসের

আনাচে কানাচে ভরে উঠছিলো। বাসের সমস্ত যাত্রী এমনকি কণ্ডাক্টর পর্যন্ত কথাবার্তা সংক্ষেপ ও সংযত ক'রে দাদুর কথা শোনার জন্য কান খাড়া ক'রে রেখেছিলো। এমন জমাটি গল্প তারা কখনও আর কারো কাছে শোনে নি!

—দিদিমার কম বয়স বললেন, তাকে যুবতী বললেন, একান্ন বছর বয়স কি কম হোলো? প্রশ্ন করলো এক যুবক।

—আহা—হা—হা! অত অধৈর্য হলে সব বলি কি ক'রে! আমরা দেখি রূপ, শুনি শব্দ, আঘ্রাণ করি গন্ধ, আস্বাদ করি রস আর অনুভব করি স্পর্শ। এই পঞ্চইন্দ্রিয় আমার স্তব্ধ হ'য়ে গেল। চারটে বছরও কাটলো না। হঠাৎ রান্নার ষ্টোভ ফেটে বৌ-টা পুড়ে, ঝলসে, ঘেয়ো হ'য়ে পনেরো দিন ভুগে মারা গেল। বড় ব্যস্ত হ'য়ে পড়লাম। সাথী হারানোর শোক-জ্বালা এক ভয়াবহ বিভীষিকার সৃষ্টি করলো। ভয় আর আর্তনাদ আমায় অহরহ অস্থির করে তুললো। সর্বশক্তি-মানের এই হোলো বিচার—

'দেবে যাহা করে তাহা কে করে অন্যথা—
ঈশ্বরের ইচ্ছা হেন, খেদ করা বৃথা।'—

—তবু মন মানে না। আধপোড়া ঘেয়ো কুকুরের মত, বাড়ী ছাড়া এক সন্ত্রস্ত ফেরারী আসামীর মত এক প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রনায় ছটফট করে চারিদিক ছুটোছুটি করতে লাগলাম। সে এক জমাট নির্জনতা। এ হেন নির্জনতা সহ্য করতে পারে হয় পশু কিংবা দেবতা। যোগাভ্যস্ত সাধকেরও এই সংযম সহজসাধ্য নয়।

বঙ্কিমবাবু হঠাৎ চুপ করলেন। মনে হয় একটু দম নিলেন।

একদল যাত্রী নিঃশব্দে এক বৃদ্ধের জীবন-ইতিহাস শুনছে। গল্পের শুরু কোথায় তা কারো মনে নেই। ব্যথা আর শোকভরা এ গল্পের শেষ কোথায় তা-ও কারো জানা নেই। দাদুকে দেখে অনেকের মায়া হ'লো। অদৃশ্য এক শক্তির কঠোর শাসনে বেচারার জীবনটা হ'য়েছে তছ্‌নছ্‌। এই সেই মানুষ—যিনি তিন টাকায় এক জোড়া নক্সা পাড় শাড়ী আর ন' সিকেয় এক জোড়া মিলের মিহি চিকন ধুতি

কিনেছেন। এই মানুষের বাল্যজীবনে কণ্ট্রোল ছিল না, ক্যিউ ছিলনা আর ছিলনা ব্ল্যাক মার্কেট। অদম্য উৎসাহ উদ্যোগ আর পরিপূর্ণ সম্বিত বুকে জমিয়ে ইনি কাটিয়েছেন এতগুলো বছর।

—এই যে মা, বাইরে হাত রেখো না, কনুই উড়ে যাবে—দাহু সাবধান ক'রে দিলেন এক মহিলাকে।

যাত্রীরা সব চুপ। তপন ছোট্ট ক'রে প্রশ্ন করলো, তারপর কি হোলো দাহু ?

—ও ! হ্যাঁ, তিনটে বছর কাটিয়ে দিলাম। একদিন বাড়ীতে হরিনামে বিভোর হ'য়ে জপ করছিলাম, হঠাৎ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর ছোট বোন শর্মিলা, মানে আমার ছোট শালী এসে হাজির হোলো। সে-ও বিধবা। বয়স মাত্র বত্রিশ। যেমন সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, তেমনি স্মার্ট। সে আমায় ভাল বাসলো কিনা জানি না--তবে সে খুব সহজভাবে আমায় দয়া করলো। বললো, আমি তোমার কাছেই থাকব। তাকে আমি বিবাহ করলাম।--কোন্ ষ্টপে এলাম ভাই ? ও ! আলমবাজার।

শ্রোতারা এমন ঘটনাকে বড় বিরল ব'লে মনে করলো। এই অস্থিচর্মসার মানুষটাকে কেমন করে তার আধাবয়সী এক সুন্দরী রমণী স্বামীত্বে বরণ করলো !

তিন জনের মধ্যে সেরা কোন্‌টি দাহু ? চাপা কণ্ঠের প্রশ্ন ভেসে এল।

অনেকের কৌতুকমাখা হাসির মাঝেই দাহু বললেন—তৃতীয়টি। প্রথমজন ছিল ধর্মপ্রাণা, লজ্জাবতী, আদর্শ গৃহিণী। দ্বিতীয়টি ছিল—সাথী, মানে শ্রেফ্ কমপ্যানি। তৃতীয় জন হচ্ছে একেবারে—আলট্রা-মডার্ণ।

—আপনার সাথে আসেন না কেন তিনি ? আবার সন্দেহভরা প্রশ্ন।

—তার সময় কোথায় ? পাড়ার ক্লাবের কর্তারা তো তাকে নয়নের মণি ক'রে রেখেছে। ক্লাবের ছেলেরা আমাকে দাহু ব'লে

ডাকলেও তাকে ডাকে বৌদি ব'লে। মস্ত গুণী! সাইকেল, স্কুটার সব চালাতে পারে সে। আগেই ছিল গুণী কিন্তু আমার আওতায় থেকে হ'য়েছে বহুগুণী। তাই পাচ্ছে অসংখ্য গুণী-সম্বর্ধনা।

ক্লাসে কোনো পড়ার বেশী ব্যাখ্যা করতে বললে মাষ্টার মশাইরা বিরক্তই হন। দাদুও একটু বিরক্ত হলেন—যখন কোন এক নাতি হঠাৎ একটি প্রশ্ন হাওয়ায় ছুঁড়ে দিলো। আপনার আর কোনো সন্তান হয়নি দাদু?

দাদু সে কথার কোনো উত্তর না দিয়েই ঘড়ি দেখলেন।

ঘড়ি দেখছেন,—তাড়া আছে বুঝি? তপন জানতে চাইল। ইয়েস, সিনেমা যাব। বলেছে ছ'টা ন'টায় টিকিট কেটে রাখবো, তাড়াতাড়ি ফিরো।

—কোন্ হলে? কি সিনেমা? দ্রুত প্রশ্ন শোনা গেল।

—তা জানি না---বঙ্কিমবাবু একটু মুচকে হেসে ঘাড় নেড়ে বললেন - আমায় বড় একটা সাথে নেয় না সে। আমিও পীড়াপীড়ি করি না। তার গতি সর্বত্র। সভা সমিতি, মন্ত্রী আপ্যায়ন, মহিলা ওয়েল ফেয়ার সমিতির ৺বিজয়া সম্মেলন। আর এইসব কাজে দু'চারবার বম্বে দিল্লীও ঘুরে এলো। খুব শীঘ্রই ফরেনে যাবার চান্স আছে। কথার শেষে তিনি হেঁ হেঁ করে হেসে নিজের বাহাদুরী জাহির করলেন।

—বৌদি কি আর্টিষ্ট নাকি? মানে নাচ-গান—

—জানে, কিন্তু করে না। সর্বত্র সে সভানেত্রীর চেয়ার আঁকড়ে বসে থাকে, তার গান করার সময় কোথায়? নামকরা গাইয়ে, বাজিয়ে, সাহিত্যিক, ডাক্তার এমনকি রাইটার্স-এর হোমরা-চোমরা প্রথম শ্রেণীর বহু নেতা তার বন্ধু। কলকাতার অলিগলি, বড় রাস্তা সব তার নখ দর্পণে।

—উনি নিশ্চয়ই খুব শৌখিন? শুধালো তপন।

শৌখিন মা-নে-এ? এসো না একদিন আমার বাড়ী। দেখবে সারা নিউমার্কেট ঢুকে পড়েছে আমার সবকটা ঘরে। শত শত দেশী-বিদেশী শাড়ী, হাজার রকমের ইমিটেশন গহনা, কত রং বেরং-এর

কস্‌মেটিকস্‌-এ তিনটে আলমারী ঠাসা। আজই এসো না। ঢুকেই সামনে দেখবে ওর গ্রন্থাগার। উত্তর পাড়ার ভারত বিখ্যাত জয়কৃষ্ণ পাঠাগারের মতো সে-ও নানা জীবন-কাহিনী, ইতিহাস, ভ্রমণকাহিনী জোগাড় করেছে। রবীন্দ্র, শরৎ, আর বঙ্কিমের লেখা সব রকম বই পাবে সেখানে। প্রায় এগারো হাজার পুস্তক সংগ্রহ করেছে শর্মিলা। আরো পাচ্ছে—পাবেও।

—একদিন নিশ্চয়ই যাব আপনার বাড়ী।—এই শেষ বয়সের সব সঞ্চয় তা'হলে ঐ সব কিনতেই খসে গেছে আপনার?

—ভুল! তেমন বোকামী সে করে না। সব কিছুই গিফ্‌ট পাওয়া। কোন্ ষ্টপেজ এটা? সিঁথির মোড়? এরপর চিড়িয়া মোড়, তারপর পাঁচ মাথা। তুমি যাবে তো এসো। বাগানের জিনিষগুলো সীটের তলা থেকে বার করি।—এই নাও, তুমি একটা হাতে নাও। এই তো নেমেই বাড়ী—খুব ভারী লাগছে না তো?

বাগবাজারে গাড়ী থামা মাত্রই বঙ্কিমবাবু নেমে পড়লেন। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না ক'রে তিনি হনহনিয়ে চলতে আরম্ভ করলেন। দম দেওয়া পুতুলের মত গ্রহের গতি অনুসরণ করে উপগ্রহরূপী তপনও লাফাতে লাফাতে হাঁটতে লাগল।

বাঁকুবিহারী সাহা পলিক্লিনিকের পাশ দিয়ে রাস্তা। খানিকটা গিয়েই তপন বললো—না, আজ আর যাব না এই তাড়াহুড়ো করে, তাছাড়া—

নো-ও-ও! তা হবে না। কথা যখন দিয়েছো, তখন যেতেই হবে তোমাকে। ঐতো বাড়ীর ছাদটা দেখা যাচ্ছে। পুলিশের চাকরীতে বেশ দুটো পয়সা কামিয়েছিলাম। তখনই বাড়ীটা করেছি, বুঝলে? এত কাছে এসে দেখে যাবে না বাড়ীখানা। ঐতো দোতলা বাড়ী। এই তো সবুজ গেট। দাও থলিখানা। একটু দাঁড়াও তো! আগে খবর দিয়ে, তোমায় ভিতরে নিয়ে যাব। গেটের সামনে গিয়েই বঙ্কিমবাবু থমকে দাঁড়ালেন।

গেটে দাঁড়িয়েছিল বাড়ীর ঝি বিজলী। থলি দুটো তাড়াতাড়ি

ধ'রে নিয়েই সে বললো, আপনার দেরী দেখে এইমাত্র দিদিমণি বেরিয়ে গেলেন। এখনও পৌঁছোন নি রাস্তায়।

—বেরিয়ে গেল! মনে হয় ঐ রাস্তা দিয়েই গেছে। তাড়াতাড়ি এসো—তপন! ঠিক তাকে ধরে ফেলব। ঐ যে বলছিলাম না, সবই যুগের হাওয়া। আমরা বিবেকানন্দও নই, আবার শঙ্করাচার্যও নই, রক্তমাংসের এই কাঠামোটার মাঝেই দোষ গুণ, ত্রুটি, বিচ্যুতি, ন্যায়—অন্যায় সব সাজানো আছে। দ্বারবাসিনীতেও শ্মশান আছে আবার ত্রিবেণীতেও শ্মশান আছে।—ত্রিবেণীতে অত ভীড় কেন? একজনের সাথে অন্যজনের তফাৎ প্রচুর। এ জগতে কে পুণ্যবান, কে ধার্মিক তার বিচার করবে কে? সর্বগ্রাসী ও সর্বনাশা নেশা, জুয়া, মদ বা অন্যান্য যে সব উপসর্গ মানুষকে উৎশৃঙ্খল আর সর্বহারা করে, আমি সে দলের সভ্য নই। বলতে পারো তপন, বিচার করতে পারো—তবু আমি আজ এত অসহায় আর নিঃসম্বল কেন? কেন সবকিছুর অধিকারী হ'য়েও আমার অস্তিত্ব এত বিপন্ন?

প্রশ্ন খুব সহজ আর পরিষ্কার। মাকড়সার জালে আটকে পড়া মাছির মত তপন বড় অসহায়। এ প্রশ্ন চাঁদ সূর্যকে করেছে বহু বার। এইভাবে বিপন্ন হ'য়ে ভোরের নিষ্পাপ শিশির-বিন্দু বৃক্ষরাজির কোমল কচি পাতাগুলোকে করেছে এই প্রশ্ন। কেউ কি যোগ্য উত্তর পেয়েছে কখনও? তপনও চুপ করে রইল।

ঘাড় সোজা ক'রে দ্রুত চলতে চলতে বঙ্কিমবাবু আবার শুরু করলেন, কেউ কাউকে চিনলোনা ব্রাদার। যারা আজকে রাশিয়াকে নিয়ে মাতামাতি করছে—তারা কি জানে স্টালিন মাসের তেইশ দিন থাকতো গ্রামে আর মাত্র সাতদিন থাকতো শহরে,—শহুরে মুখোশ প'রে। ঈশ্বরকে মানতেন না মাও সেতুং। এর অর্থ কি এই যে বুদ্ধদেবের অস্তিত্বে তার সন্দেহ ছিল? কেউ বলে নিমাই ভগবান। তাহ'লে শ্রীকৃষ্ণ কে? যার যা খুশী বলছে, শুনছে, করছে। সবই একটা আপোষ মীমাংসা। লক্ষ্য এক, ভিন্ন পথ। মাদ্রাজের পুরোহিত সত্যিকার নিরামিশাষী কিন্তু বাংলার পুরোহিতের মাছ না

হ'লে ভাত রোচে না। সব কিছুই সহ্য করতে হবে ব্রাদার। প্রতিবাদ করলেই বিপদ।

সব কিছু সহ্য করেই তো আপনার কাটছে। আপনার মত এমন সহ্যশক্তি ক জ'নের আছে বলুন?—চলার ছন্দ বজায় রেখে বলল তপন।

—না, না-আ আর সহ্য করতে পারছি না, অসহ্য লাগছে এই বার্ধক্য। বৃদ্ধরা আজ সমাজের সর্বত্রই অবহেলিত ও অবাঞ্ছিত। শুধু তোমরা কেন, সকলেই হারিয়েছে এই নিঃসঙ্গ, অসহায় বৃদ্ধদের সম্মান, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি দেখাবার প্রয়োজন বোধ।

—এটা আজ সত্যই একটা জাতীয় প্রশ্ন। সরকারেরও এর জন্য নিয়ম ক'রে কিছু একটা করার প্রয়োজন।

—সরকার করবে? ছ্যা! যারা দশের বা দেশের জন্যে সারা জীবন তিলে তিলে প্রতিটি রক্ত বিন্দু ঢেলে দিলো, সেই দেশের মাঝেই তারা মরছে—হয় না খেয়ে কিংবা ভিক্ষা ক'রে। দেখো ব্রাদার, আমার প্রতিটি পক্ককেশের অনুপরমাণুতে মিশে আছে শুধু হায় হায় আর্তনাদ। দলে দলে আজ আমাকে বুড়ো ব'লে উপহাস করে,— ভেংচি কাটে, গায়ে কাদা ছিটিয়ে দেয়। তার মানে বৃদ্ধদের কি বাঁচার অধিকার নেই—তাহ'লে তাদের গুলী ক'রে হত্যা করেনা কেন?

—কি করবো বলুন? বৃদ্ধদের তো কোনো অন্যায় দেখিনা! তারা সম্পূর্ণ নির্দোষ।

এক রকম চিৎকার করেই বঙ্কিমবাবু বললেন, সাবধান, খুব সাবধান ব্রাদার। কখনও বৃদ্ধ হ'য়ো না। যদি হও, কারো সামনে বেরিও না। বেরুলেও কারো সাথে কথা বোলো না। তোমার কথা, তোমার উপদেশ শুনে তারা তোমায় পাগল আখ্যা দেবে। আর শেষ কথা বলি, বৃদ্ধবয়সে তরুণী বিবাহ—এ্যাবসার্ড!—ব্লানডার। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা, এ হ'চ্ছে সুগার-কোটেড কুইনাইন। বড় জ্বালা, বড় মারাত্মক, আর ভীষণ ভয়াবহ।

বৌদির কিন্তু উচিৎ ছিল আপনার জন্য অপেক্ষা করা, বলল তপন।

—না-না, তার সমালোচনা কোরো না। শর্মিলাকে বাইরে থেকে দেখলে হয়তো নিন্দার যোগ্য মনে হবে; কিন্তু মাইডিয়ার, ওর মনের পর্দা সরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে দেখবে ওর মাঝে কোনো অনাচার বা অসামাজিক কিছু নেই। সে একেবারে হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট সতী নারী। বাঙালী পরিবারের লাখো লাখো সু-গৃহিণীর একজনও তার নখাগ্র স্পর্শ করার গুণ রাখে না। এক কথায়, সে হচ্ছে এ জগতের একমাত্র কর্তব্যপরায়ণা রমণী এবং এই সমাজের সুশীলা ও প্রেমময়ী ভার্য্যা। তাকে ভুল বুঝোনা, সে আমায় ভালোবাসে, দয়া করে, আমার কথা অন্তর দিয়ে চিন্তা করে।—ব্রেভো! হুর্‌রে! ঐ তো ট্যাক্সিতে উঠছে ওরা! দৌড়ে এসো তপন! বা! ভালই হয়েছে। ট্যা—এক্—সি-ই-ই—রো—খো-ও-ও।

—আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে বঙ্কিমবাবু তারস্বরে চিৎকার করলেন, তারপর লেংচে লেংচে, ট'লে ট'লে ছুটতে লাগলেন।

ট্যাক্সি ষ্টার্ট দিয়ে আবার ব্যাক্ করে দাঁড়ালো। প্রথমে নামলেন একজন স্যুট্-টাই পরা স্মার্ট প্রৌঢ়! তারপর শর্মিলা।

কাঠগড়ার আসামীর মত দাঁড়ালেন বঙ্কিমবাবু, তার পাশে দাঁড়ালো তপন একই ভঙ্গিতে।

বঙ্কিমবাবুর শেষ বয়সের স্ত্রী, এক ধনী, উদাসীন ও ভাবোন্মাদী বৃদ্ধের সহধর্মিনী শর্মিলা,—শাড়ীর নিম্নভাগ বাঁ-হাতের দুটি আঙুলে ঈষৎ তুলে ধরে, এসে দাঁড়ালো দু'জনের মাঝখানে।

তপন তন্ময় হ'য়ে চোরা চাউনীতে দেখলো শর্মিলাকে। একি মানবী না দেবী! ভদ্রেশ্বরের ভদ্রকালীর পাথরের মূর্তির কোমল ও সজীব মুখখানি যেন শর্মিলার মুখে বসানো। তার চোখের দৃষ্টিতে এমন ভীষণতা আর মাধুর্যের অদ্ভুত মধুর সমন্বয়, বড় একটা কোথাও দেখা যায় না।

শরীরে হিল্লোল তুলে ঘাড় উঁচু করে শর্মিলা বললো, ইনি হচ্ছেন

হেড্ অব্ দি ডিপার্টমেণ্ট অব বেঙ্গলী।—মিঃ দাশগুপ্ত। এঁনার সাথেই সিনেমা যাচ্ছি। তোমার এই ঠাণ্ডায় না যাওয়াই ভালো। বাইরে ডিনার খেয়ে ফিরব। রাত হ'লে ভেবো না। তোমার খাবার ঢাকা দেওয়া আছে। বিজলীকে সন্ধ্যা দিতে বোলো। ওষুধ খেতে ভুলোনা—কেমন ?

দু'জন আগন্তুকই বোবা। যে বঙ্কিমবাবু শ্রীরামপুর থেকে একুশটা ষ্টপ শুধু গল্প করে ঝড় তুলছিলেন—এখন তিনি স্তব্ধ নির্বাক—শুধুই শ্রোতা। তিনি এখন একমনে শুনে নিলেন হাজারো নিষেধ আর সাবধান বাণী।

তপন হাঁ ক'রে তাকিয়ে ছিলো শর্মিলার মুখের দিকে। শর্মিলার একরাশ ঢেউ খেলানো চুলের মাঝে ছিল জ্বলজ্বলে সতী চিহ্ন। পরণে আকাশি রঙের বিদেশী পিছল শাড়ী, নাকে, কানে, গলায় ঝক্‌ঝকে ঝলসে ওঠা হীরে। কোমর ভরা একটু বেশী মেদ।

তপনের দিকে চেয়ে মুচকী হাসলো শর্মিলা। ছেলে ভোলানো ঢং-এ বললো, আজ থাক্, আর একদিন এসো ভাই—আলাপ করবো।

মুহূর্তে পিছু ঘোরা শেষ ক'রে শরীরের সাতটা ভাঁজে ঢেউ খেলিয়ে দিয়ে শর্মিলা ট্যাক্সির ভিতর ঢুকলো। ট্যাক্সি মিলিয়ে গেল শ্যামবাজারের পাঁচমাথা মোড়ের দিকে।

ট্যাক্সির গতিপথে দৃষ্টি রেখেই বঙ্কিমবাবু প্রশ্ন করলেন,—কেমন দেখলে হে তপন ?

তপন পাশে ছিল না। দাছুর খপ্পর এড়াতে সে এই সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করেতে তিন লাফে সামনের একটা ফাঁকা বাসের আড়ালে দাঁড়ালো। এবং ঘাড় লম্বা ক'রে লুকিয়ে দেখতে লাগলো বঙ্কিমবাবুকে। তার সারা অনুভূতিতে তখনও মাখানো শর্মিলার রূপ-লাবণ্য, গৌরব আর মিষ্টি ব্যবহার।

তপনের খুব ভাল লাগলো ঐ শর্মিলা বৌদিকে। আজ পর্যন্ত সে যতজন বৌদিকে দেখেছে বা চিনেছে—তাদের মধ্যে সর্ব সেরা

হ'চ্ছেন এই বৌদি! আরো খুসী, সে যখন ভাবলো—তার অতীতের স্মৃতিতে যত গল্প আটকে আছে—তাদের মধ্যে সব চেয়ে সরেস ও মিষ্টি গল্প সেইটে,—যেটা বলতে সময় লেগেছিলো এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট; অর্থাৎ গল্পের আয়তন—পনের মাইল, শ্রীরামপুর থেকে বাগবাজার।

তপন দুঃখ পেলো। দীর্ঘ নিঃশ্বাসকে অনেকক্ষণ চেপে ধ'রে সে স্পষ্ট দেখলো, বৃটিশ আমলের ছ'ফুট ন'ইঞ্চি লম্বা পুলিশ অফিসার বঙ্কিম হালদার তার জরাজীর্ণ কঙ্কালটাকে অতি কষ্টে বহন করে, এক অন্ধ বৃদ্ধ ভিখারীর লাঠি নিয়ে রাস্তা পার হবার মতো ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন। অতীতের ও বর্তমানের সবটুকু হিসাবের বোঝা এবার ঠিক জমা পড়বে ভবিষ্যতের অনিশ্চিত স্বপ্নময় স্মৃতিপটে।

দেবী

দেবীর ঠাকুমা প্রতি বছরই একবার করে দেশ ঘুরতে যান। তীর্থ করতে যান বলাটাই ঠিক। সাথে কোনোবার ছেলে থাকে, কোনোবার ছেলের বউও যায়। নাতনী দেবী কিন্তু থাকে প্রতিবার। এই নিয়ে চোদ্দবার দেশ ঘোরা হল। মজার ব্যাপারটা কেউ না জানলেও এ কথাটা সত্য যে ঠাকুমা দেবীর কপালে হাত রেখে প্রতিটি তীর্থ ক্ষেত্রে কি যেন মানত করেন।

মানত করতে প্রথমবার তিনি গেলেন বীরভূমের শাক্তপীঠ এবং বহুতান্ত্রিক ও সাধকের সিদ্ধি লাভে ধন্য তারাপীঠে। শোনা যায় বুদ্ধদেবের নির্দেশে বশিষ্ঠ মুনি এই তারাপীঠের মহাশ্মশানে এসে এক শ্বেত-শিমূল গাছের নীচে পঞ্চমুণ্ডির আসন স্থাপন করে মা তারার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। সেই থেকেই তারামা-র খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

তারাপীঠের কাছে আটলা নামে এক গ্রামে ঠাকুমার আদি নিবাস। শ্বশুরবাড়ী বোলপুর। বাপের রেখে যাওয়া সম্পত্তি কিছু না থাকলেও শ্বশুরের তিনখানা বাড়ীর মালিক তিনি। তাঁর স্বামী ছিলেন উকিল। একমাত্র ছেলের বিয়ে দেবার পর তিনি বিধবা হয়েছেন। নাতনী দেবীকে সামলাতে তাঁর দিন কেটে যায়।

দ্বিতীয় বছর ঠাকুমা গেলেন বক্রেশ্বর গ্রামের উষ্ণ প্রস্রবণগুলি দেখতে।

ঐ গ্রামের উত্তর-পূর্বে বক্রেশ্বর এবং দক্ষিণে পাপহরা নদী প্রবাহিত। প্রস্রবণগুলির নাম খুবই আকর্ষণীয়। ব্রহ্মকুণ্ড, সূর্যকুণ্ড, খরকুণ্ড, ভৈরবকুণ্ড, জীবিত কুণ্ড এবং চন্দ্রকুণ্ড। এ ছাড়া আরেকটি প্রস্রবণ আছে যার নাম অগ্নিকুণ্ড। দেশ-দেশান্তর থেকে বহু তীর্থ যাত্রী এসে জমে এইখানে। অগ্নিকুণ্ডের উষ্ণ বাষ্প নাকি জনগণের

শ্বাসকষ্ট দূর করে। এই কুণ্ডের জলপান পেটের রোগের উপশম ঘটায়। এই উষ্ণ জল কোন এক দেবতা মানুষের উদ্দেশে পাঠিয়েছেন। সেই দেবতার উদ্দেশ্যেও ঠাকুমা মানত করলেন।

তৃতীয় বছরে সাঁইথিয়ার দেবনন্দিনী মহাপীঠ ঘোরা শেষ করে চতুর্থ বছরে তিনি গেলেন চণ্ডীদাসের নান্নুরে। কীর্ণাহার ষ্টেশনের পাঁচমাইল দক্ষিণে এই নান্নুর গ্রাম। এই গ্রামই বিখ্যাত বৈষ্ণব পদাবলীকার ও শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাসের আবির্ভাব ভূমি। এখানেও তিনি মানত করতে ভোলেননি।

পরের বছর ঠাকুমা গেলেন নিত্যানন্দের জন্মস্থলী গর্ভাবাস। এইখানেই ভীমচন্দ্র হিড়িম্ব নামক রাক্ষসকে বধ করে তার ভগিনী হিড়িম্বাকে বিবাহ করেন। এই গ্রামেই নিত্যানন্দ মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন। এইখানের গৌর নিতাই বিগ্রহের সামনে তিনি নাতনীর মাথায় হাত রেখে মানত করলেন পঞ্চমবার। দেবীর তখন বয়স এগারো।

হাওড়ার ষ্টেশন থেকে বর্ধমান হয়ে বোলপুর ষ্টেশনের দূরত্ব মাত্র একশো ছেচল্লিশ কিলোমিটার। জনশ্রুতি আছে, রাজা সুরথ এই অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। কিংবদন্তী আছে এই রাজা একবার দেবী চণ্ডীর কাছে এক লক্ষ বলি প্রদান করেন। সেই থেকে এই স্থানের নাম বলিপুর। বোলপুর প্রাচীন বলিপুরের সংস্কৃত নাম। বোলপুর থেকে শান্তিনিকেতনের দূরত্ব মাত্র একমাইল।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পিতা এবং ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম প্রবক্তা ও প্রচারক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা। দেবেন্দ্রনাথ একবার পালকী করে যাবার পথে বোলপুরের উত্তরে এক সীমাহীন প্রান্তর দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ঈশ্বর সাধনার জন্য এই নির্জন স্থানকে উপযুক্ত ভেবে তিনি রায়পুরের প্রতাপনারায়ণ সিংহের কাছ থেকে কুড়ি বিঘা জমি ক্রয় করলেন। এইখানে তিনি প্রথম যে মনোরম অট্টালিকা তৈরী করেছিলেন তারই নাম শান্তিনিকেতন। এখন সেই অট্টালিকা শান্তিনিকেতন অতিথিশালা নামে খ্যাত।

দেবীর পিতা প্রথম থেকেই শান্তিনিকেতনে লেখখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছিলেন। দেবীর ভাগ্যে তা আর হয়ে ওঠে নি। আদরের নাতনীকে এক মাইল দূরে শান্তিনিকেতনে না পাঠিয়ে বোলপুরের স্কুলেই পড়াবার বন্দোবস্ত করেছিলেন ঠাকুমা।

ঠাকুমার প্রাণ ঐ নাতনী। সব কাজ ছেড়ে, সব কিছু ভুলে তিনি প্রতি বছরই মানত করে বেড়াচ্ছেন। মানত সফল হলে তিনি তাঁর বাড়ীতে ব্রাহ্মণ ভোজন, কাঙালী ভোজন করাবেন। কাছাকাছি দেব-দেবীর চরণে ঘটা করে পূজোও দেবেন।

পরপর লাভপুরের দেবী-ফুল্লরা, নলহাটির ললাটেশ্বরী, বারাগ্রামের ভুবনেশ্বরী, গুপ্তবৃন্দাবন ধাম মুলুকের রাধাকৃষ্ণ, দ্বারকার দণ্ডকেশ্বর শিব, চারফল গ্রামের কণকেশ্বরী দেবী, মল্লারপুরের মল্লনাথ শিব, কাকপুরের অপরাজিতা দেবী এবং পাইকোড়ের খ্যাপাকালীকে মানত করলেন।

হ্যাঁ ঠিক! চতুর্দশ মানতের পর ঠাকুমা সুফল পেলেন। সকলের ভাগ্যে হয়ত এই ভাবে সুফল আসেনা। এতদিন ধরে ভক্তিশ্রদ্ধা দিয়ে তিনি যে কঠিন ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছেন তা পূর্ণ করতে চোদ্দটি তীর্থের দেবদেবী একজোটে নিশ্চয় মেতে উঠেছিলেন।

মানত সফল না হলে হঠাৎ একখানা চিঠি এলো কেন? এক অমূল্য সম্পদের মত চিঠিটা বুকে চেপে ধরে ঠাকুমা ঠাকুর ঘরে গিয়ে কাঁদবেনই বা কেন? এর নাম আনন্দাশ্রু। এ যেন লটারীর টিকিট জেতা। এ ঠিক সৈন্যদের দেশ জয়ের সামিল। দেবীর মা চিঠি পড়ে খুব খানিকটা আনন্দ করেছেন, দেবীও চিঠি পড়েছে। ঠাকুমা নিজে পড়ে শুনিয়েছেন দেবীর বাবাকে। ছোট্ট একটি চিঠি সারা সংসারকে এনে দিয়েছে এক অপরিসীম শান্তি।

চিঠি লিখেছেন অশোক নামে একটি ছেলে। এই ছেলেটি চোদ্দবছর আগে ঠাকুমার বাড়ীতে দাদা বৌদির সাথে ভাড়াটে ছিল। যেমন দাদাবৌদি তেমনি ভালো ছিল ঐ অশোক। ছোট্ট ছেলে হলে কি হবে যেন সোনার টুকরো। যেমন লেখাপড়ায় মাথা, তেমনি সুন্দর

ফুটফুটে রাজপুত্রের মত চেহারা। ঠাকুমার খুব ইচ্ছাছিল। তাই অশোকের দাদাবৌদির কাছে তিনি কথাও পেড়েছিলেন। অশোকের বৌদিকে বলেছিলেন, জানো বৌমা তোমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের স্বজাতি তার উপর পাল্টাঘর। অশোককে আমি নাত-জামাই করব। এই বাড়ীখানা ওদের নামেই লিখে দেব।

অশোকের দাদা সেকথা শুনে মুচকি হেসে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, ভালোই তো! তাহলে আমায় আর ভাড়া গুণতে হবে না।

মানুষ ভাবে এক কিন্তু হয় আর এক। বদলির চাকরী। তাই চারবছর বোলপুরে থাকার পরই অশোকের দাদার বদলির হুকুম এলো। পুরোনো ভাড়াটে চলে গেলে বাড়ীওয়ালারা খুশীই হয়। এক্ষেত্রে তা হলো না। আধ ভাঙা একটা পুতুল হাতে করে দেবী এক দৃষ্টে চেয়ে রইল। ছ-বছরের মেয়ে সে, তাই বোধ শক্তি তেমন প্রখর হয় নি। অশোক হাফ্ প্যান্ট আর হাফ্শার্ট পরে ঠাকুমাকে প্রণাম করল। প্রণামের অর্থ বিদায়। ঠাকুমা পুত্র হারানোর শোকে ভেঙে পড়লেন। সামনা সামনি বাড়ী। যাতায়াত ছিল ঘন। আলাপ ছিল জমাটি। কে বাড়ীওয়ালা আর কে ভাড়াটে বোঝাই যেত না। অশোককে এত তাড়াতাড়ি বিদায় দিতে হবে একথা তিনি কিছুতেই মানতে পারছিলেন না। ন-বছরের ছেলে অশোকের পাশে ছ-বছরের দেবীকে বড় সুন্দর মানাত। দেবীর মিষ্টি রঙ, তুলি আঁকা ভ্রূ, চোখ, আজ যেন কিছুটা ম্রিয়মান হয়ে উঠল। বুকফাটা আর্তনাদ চেপে রেখে ঠাকুমা অশোককে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, তুমি আমার নারায়ণ। এই ঠাকুমাকে যদি কখনও ভালোবেসে থাক তাহলে সময় পেলে আবার এসো। ঠাকুমাকে ভুলো না। চিঠি দিও।

সেই চিঠি-ই এসেছে। চোদ্দবছর পরে অশোক আসছে ঠাকুমার কাছে। সেই আগমন সংবাদ জানাতেই লিখেছে চিঠি। চোদ্দতীর্থে ঠাকুমার মানত ছিল। অশোক যেন ফিরে আসে। আজই অশোক আসবে ঠাকুমার কাছে। প্রায় পঁচিশ বার চিঠিটা পড়েছেন ঠাকুমা। স্পষ্ট করে অশোক লিখেছে বর্ধমান হয়ে কর্মক্ষেত্রে যাবার পথে

শুক্রবার বারোটা নাগাদ বোলপুরে নামবে। ছোট বেলাকার স্কুল-জীবন আর ঠাকুমার প্রাণ ঢালা আদর ভালোবাসা সবই তার মনে আছে। শেষে প্রণাম জানিয়ে ইতি টেনেছে।

সারা বাড়ীতে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

বারোটা বেজে বেলা গড়িয়ে এলো। অশোক এলো না।

দেবীর হলো রাগ। শুক্রবার অর্থাৎ আজই সন্ধ্যায় তার কলেজে মিউজিক কম্পিটিশন। গানের মাষ্টার দু'বার এসে ঘুরে গেছেন। গান-গুলো একটুও প্র্যাকটিশ করতে দেবীর মন চায়নি, শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যার গান গাইতে যাওয়া হবে কিনা, তাও কেউ জানল না।

অনেক যুক্তি করে ঠিক হল মাষ্টারের সাথে সন্ধ্যায় দেবী যাবে কলেজের মিউজিক কম্পিটিশনে। অশোক যদি একান্তই এসে পড়ে তাহলে প্রয়োজন বোধে সে দেবীর কলেজে যাবে দেখা করতে।

ঠাকুমার কথামত কাজ হল। সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার মাষ্টারের সাথে দেবী বেরিয়ে যাবার পরমুহূর্তেই এলো অশোক। এলো যেন রাজপুত্তুর। তেইশ বছরের অশোক প্রকৃতির দেওয়া সবটুকু রূপ গ্রহণ করে সুন্দর সাজে সেজেছে। ঘন কালো সাজানো চুল, সচকিত দৃষ্টি ভরা বড় দুটি চোখ, কণ্ঠে ধীর নম্র স্বর, চলায় বলায় ভদ্রতা সভ্যতা।

ঠাকুমার পায়ের কাছে ঝুঁকে পড়ে প্রণাম করলো অশোক। কারো কোনো প্রশ্নের আগেই খুব দুঃখ প্রকাশ করে বললো দু-ঘণ্টা ট্রেণ লেট ঠাকুমা।

প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করে ঠাকুমা জলখাবারের ব্যবস্থা করলেন। খাবার খেতে খেতেই অশোক বহু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চললো।

অশোককে আজই ফিরতে হবে। তাই গত চোদ্দ বছরের ইতিহাস সে চোদ্দ মিনিটেই শেষ করলো।

দাদার বদলি হলো বোলপুর থেকে মেদিনীপুর। সেখানে স্কুল ও কলেজের পড়া শেষ করে অশোক কলকাতায় মাসির বাড়ী থেকে

ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে মিলিটারীতে যোগ দিয়েছে। নতুন চাকরি তাই ঠিক সময়ে ফিরতে হবে। সময় খুবই কম।

ঠাকুমার কাছে বিদায় নেবার সময় অশোক প্রশ্ন করলো দেবীকে দেখলাম নাতো!

দেবীর কথা ঠাকুমা অনেকবার তুলতে চেয়েছিলেন। এখন সুযোগ পেয়ে বললেন, ওমা সেতো সারাদিন অপেক্ষা করে বসেছিল। ওর কলেজে আজ মিউজিক কম্পিটিশন্। যাবোনা যাবোনা করে এইমাত্র বেরোলো। যাওয়ার পথে ওর কলেজে একবার দেখা করে যেওনা ভাই।

দেবী এই মাত্র বেরোলো কথাটা অশোকের কানে ঝঙ্কার দিল। চোদ্দ বছর পরে আজ দেবীকে দেখার আশায় সে মনে মনে কল্পনায় যে রঙীন জাল বুনেছিল তা যেন ছিঁড়ে শত টুকরো হয়ে গেল।

—দেবী এখন কি পড়ছে ঠাকুমা? অশোকের আনমনা কণ্ঠে শুকনো প্রশ্ন।

—ও এখন বি. এ. পডছে। গানে সে খুব নাম করেছে। সত্যিই, কত বছর পরে দেখা হলো, আজকের দিনটা থেকে গেলেও তো পারতে ভাই।

থাকতে পারলে তো ভালোই লাগত। ছোট বেলাকার কত কথাই মনে পড়ছে। সেই যে আমরা চলে যাবার সময় দেবী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, আপনি তাকে ভোলাচ্ছিলেন। সেই কান্নার কথা দেবীর মনে আছে এখনও? অশোক কান খাড়া করে রইল বোকা-প্রশ্নের মনগড়া উত্তর শুনতে।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ঠাকুমা বললেন, সব মনে আছে ভাই। কত ভাড়াটে এলো গেল, কিন্তু তোমাদের কথা সব সময় মনে পড়ে।

অশোক একটু ভেবে নিল। দেবী আজ কুড়ি বছরে পা দিয়েছে। মিউজিক কম্পিটিশনে নাম দিয়েছে, অথচ এই দেবী শিশুকণ্ঠে সেদিনও তার সামনে বসে জল পড়ে, পাতা নড়ে ছড়াটা সুর করে গাইতো। আর মাঝে মাঝে কচি লজ্জা ভরা মুচকি হেসে মুখ ঘুরিয়ে

নিত। মাঝখানে কেটে গেছে একটা যুগ। রামচন্দ্র বনবাসে ছিলেন চোদ্দ বছর। কয়েদীরা গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে কারাগারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করে, সেও চোদ্দ বছর। অতীতের এক ৺বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় দেবী তাকে প্রণাম করেই ছুটে পালিয়েছিল। কি লাজুকই না ছিল ঐ ছোট্ট মেয়েটা। তার তো সবকিছু মনে আছে। কিন্তু দেবী কি সব ভুলেছে?

বিদায় নিয়ে হন্‌হন্‌ করে অশোক হেঁটে চলল দেবীর কলেজের পথে। আরও জোরে হেঁটে ঢুকলো কলেজ প্রাঙ্গণে। তিন লাফে উঠলো দোতলায়। উফ্‌! কি ভীড়! সে দেবীকে এক মুহূর্ত দেখেই ফিরে যাবে। মিলিটারীর নতুন চাকরী। সময় মত হাজিরা না দিলে অনেক কৈফিয়ত দিতে হবে। সে অবশ্য দেখা না করেও চলে যেতে পারত। দেবীও তো তাই করেছে। সেই রকমটি করলেই যোগ্য ব্যবহার করা হত।

না, তা করা হল না। ছাত্রদের ভীড় সামনে,—পিছনে দলে দলে ছাত্র। হল ঘর ছাপিয়ে ভীড় এসেছে বারান্দায়। বারান্দা উপ্‌চে ভীড় উঠেছে বারান্দার রেলিং-এ। ভীড় শেষ হয়েছে সিঁড়ির মুখে। নানা চিন্তার মাঝে অশোক হাঁপাচ্ছিল। কোথায় দেবী?

হল ঘরের একপ্রান্তে মঞ্চ তৈরী হয়েছে। মঞ্চের উপরে তবলা জোড়া আর হারমোনিয়াম এক মনে ধ্যানে বসেছে। মঞ্চের সামনে বসেছে বিচারকের দল। পাশে বসেছে জনা কুড়ি, কুড়ি-বাইশ বছরের প্রতিযোগী। সবকটিই যেন দেবী। চোদ্দবছর আগে হারিয়ে যাওয়া সেই ছোট্ট দেবী যে কোনটি তা কিছুতেই বোঝা গেল না। সব কটিরই লম্বা চুল, গোল মিষ্টি মুখ আর যৌবন ভরা চেহারা। দেবীর চোখ দুটোতো বেশ বড় ছিল। উপর পাটীর বাঁদিকের একটা দাঁত উঁচু ছিল। খুব বেশী হাসলে দাঁতটি বেরিয়ে আসত। তখন তাকে কি সুন্দর-ই না দেখাতো। অশোক বহুভাবে খুঁজলো দেবীকে। পুজো প্যাণ্ডেলের ভেতরে ছোট ভাইবোনকে খুঁজতে কষ্ট হয় না। আজ কিন্তু অশোককে হার মানতে হলো।

একদল যুবক ব্যস্ত হয়ে মঞ্চের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিল। পাজামা-পাঞ্জাবী পরা একটি ছাত্র মাঝে মাঝে এক ঠ্যাঙে দাঁড়ানো মাইকটিকে চেপে ধরে বলছিল, আপনারা চুপ করে বসুন এখনি গান আরম্ভ হবে। হায়! কলেজের ছাত্র-ছাত্রীকে চুপ করানো কি এত সহজ?

অশোক সিঁড়ির মুখটার কাছে দাঁড়ালো। তার মনে, অন্তরে, বিবেকে, চলছিল তালগোল পাকানো একটা দ্বন্দ্ব। সে কেন এসেছে এখানে? তার সাথে দেখা না করে, তার উপস্থিতি অবহেলা করে দেবী যখন চলে এসেছে, তখন সে কেন অস্থির হৃদয়ে ছটফটিয়ে চারিদিক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে?

অশোক চমকে উঠলো। একজন বেয়ারা তাকে ধীরে শুধালো, আপনি কি অশোক চ্যাটার্জ্জী?

—হ্যাঁ. হ্যাঁ, কেন বলো তো?

—দেবী দিদিমণি আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে বললেন।

নিরুপায় অশোক বিনীত, নম্র এবং কাতর কণ্ঠে বেয়ারাকে বললো, আমার একদম সময় নেই, এক্খুনি ট্রেণ ধরতে হবে। তুমি দিদিমণিকে এক মিনিটের জন্য আসতে বলবে ভাই! কথা শেষ করে অশোক একটা দু টাকার নোট গুঁজে দিলো বেয়ারার হাতে।

টাকা পকেটে ঢুকিয়ে বেয়ারা বললো দাঁড়ান দেখছি। পরে হলের ভেতর ঢুকে গেল। মনে ভাবলো, দিদিমণিদের সাথে দেখা করতে এসে সব দাদার-ই এমনি ধরনের তাড়া থাকে।

এবার অশোকের সামনে আসছে সেই মুহূর্ত। দেবী তার খুব চেনা অথচ অচেনা। কে আগে কথা বলবে! তুমি না আপনি? কি সম্বোধন করবে? কথার মাঝে অতীত বর্ত্তমান, এবং ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করার সময় হবে কি? এ এক ভয়ানক মুহূর্ত। দেবী এক্খুনি এসে পড়বে। চুলে চিরুণী বুলিয়ে অশোক একটু ফিটফাট হয়ে নিল। প্রচণ্ড আবেগ, উন্মত্ত অস্থিরতা আর এক কর্কশ নিষ্ঠুর দুর্বলতা তাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করলো ক্রুরতা আর মিথ্যায়

ভরে উঠলো সারা কলেজের আবহাওয়া। কই, দেবী এলো না তো! তাহলে কি বেয়ারাটা দু-টাকা নিয়ে ভেগে পড়লো? ভণ্ড, জানোয়ার চোর, বর্বরের দল কোথাকার! এই শঠ, প্রবঞ্চক, আর লম্পট-গুলোকে গুলি করে হত্যা করতে হয়।—এত দেরী হবার কারণ কি?

হঠাৎ বেয়ারা এসে দাঁড়ালো সামনে। মুমূর্ষু স্বামীর শারীরিক সংবাদ শোনার আশায় অবলা, অসহায়া স্ত্রীর অন্তরাত্মা ঠিক যে ভাবে কাতরায়, ঠিক তেমনি ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরা গলায় অশোক প্রশ্ন করলো, কি হল! দিদিমণি এলো না?

তিনি আসতে পারবেন না, এখন তার গান আছে। দু-টাকা বখ্‌শিসের উত্তর দু-লাইনেই যথেষ্ট। বেয়ারা চলে গেল। অতীতে বহু ছেলেকে বেয়ারা ঠিক এই ভাবেই সংবাদ পরিবেশন করেছে

সহ্য আর ধৈর্যের সীমা পার হলেই পুরুষ হয় উন্মাদ, নারী করে আত্মহত্যা। আঁকড়ে ধরে রাখা আশা, আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা আর স্বপ্নকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেললো অশোক। তার কল্পনা, বাসনা ও কামনার গলা টিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করলো সে নিজে। বিচলিত, জর্জরিত ও অপমানে পঙ্গু হয়ে সে নিজেকে এক ঘৃণ্য জীব বলে মেনে নিল। ষোল আনার এক আনা পাবার যোগ্যতাও তার নেই। সে পেয়েছে লাঞ্ছনা, তীব্র অবজ্ঞা আর অবহেলা।—দেবী আসবে না, কারণ এখুনি তার গান আছে। আর দেরী নয়। এবাউট্ টার্ণ। অশোক পিছু ফিরলো। একজোড়া বুট গুরুগম্ভীর আওয়াজ তুললো, ঠক্ ঠক্ ঠক্। সে দেবীকে ভালো-বাসতে আসেনি, এসেছিল চলার পথে সামান্য এতটুকু কৌতূহলকে যাচিয়ে নিতে। সব সাধ মিটেছে। গান, গান আর গান। এ সব ফন্দী। এর নাম ভাঁওতা, তা হোক, দেবী গান নিয়েই বেঁচে থাক!

দেবী যে এতটা নিষ্ঠুর, পাষাণ ও অবিবেচক তা অশোকের জানা ছিল না। তার সরল অন্তর আজ এক পাওয়া না পাওয়া, আনন্দ ভরা বেদনা আর চোদ্দ বছরের হারিয়ে যাওয়া মধুর স্মৃতি নিয়ে ছুটে এসেছিল। তার হৃদয়ের জোরালো আশাভরা চুম্বকের আকর্ষণে

দেবীর অন্তর কি এতটুকুও আকর্ষিত হয়নি ? এ কী সেই ছোট্ট দেবী, যে মেলায় নাগর দোলায় চেপে আতঙ্কে সারাক্ষণ অশোককে জড়িয়ে ধরে বসে থাকত ? এই দেবীই কি অতীতের এক দোলের দিন হঠাৎ ছুটে এসে তার সর্বাঙ্গে আবীর মাখিয়েছিল ? তাদের টবের বেল ফুল গাছ উজাড় করে সব কটা ফুল তুলে লুকিয়ে মালা গেঁথে এই দেবীই কি তার গলায় মালা পরিয়ে ছুটে পালিয়েছিল ? গানের ছুতো করে বাড়ী থেকে পালিয়ে আসা,—বেয়ারাকে দিয়ে আসতে পারবে না খবর পাঠানো—অসম্ভব। অসহ্য !

অশোক সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একটি বারের জন্যে থমকে দাঁড়ালো, ভাবলো ঠিক হয়েছে। তার স্মৃতির মৃত্যু হয়েছে। সে হেরে গেছে। তাব অসভ্যতা, পাগলামোর সাজা দিতে দেবী তার সর্বাঙ্গে হাণ্টার মেরে ক্ষত বিক্ষত করে ছেড়েছে। এই জর্জর ঘা তিলে তিলে শুকোতে সময় লাগবে হয়তো আরও চোদ্দ বছর।

আবার খট্, খট, খট্। মিলিটারী-বুটের বেদনা ভরা অভিব্যক্তি। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো অশোক। চারিদিকে লাউডস্পীকারগুলো একসাথে চীৎকার করে ঘোষণা করলো আপনাদের প্রথম গানটি শোনাচ্ছে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী দেবী মুখার্জ্জী।

হারমোনিয়াম কেঁদে উঠলো। তবলা দিলো সান্ত্বনা দেবীর সুললিত কণ্ঠের মিষ্টি সুর—ছুটে চললো পূব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে। হৃদয়ের সবটুকু প্রেম, ভালোবাসা, ধ্যান, শোক, দরদ মিশিয়ে দেবী সুর ছড়িয়ে দিল প্রকৃতির প্রতিটি স্তরে। সুরের রেশ বয়ে নিয়ে চলেছিল উদারতা, কাতরতা ও মাদকতা। দারুণ মিষ্টি করে গাইলো দেবী—

'অশ্রু নদীর সুদূর পারে ঘাট দেখা যায়।'

সিঁড়ির রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে পড়লো আক্রান্ত, আহত ও ক্লান্ত সৈনিক অশোক। মন দিয়ে শুনলো পুরো গানটুকু। ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দ্রুত নেমে গেল। আরও দ্রুত হেঁটে চললো প্রাঙ্গণ ছেড়ে ফটকের দিকে। কত কাতর হতাশা জমে আছে এই সিঁড়ির নীচে, কত আর্তনাদ, প্রতিধ্বনি ভীড় জমিয়েছে এই প্রাঙ্গণে, কত সুখ,

সৌন্দর্য ও অট্টহাসি ঢেউ তুলেছে এই ফটকের ভিতরটায় আর খোলা বাইরেটায়।

আগে বাঢ়্! তেইজ্ চল্। মিলিটারী নিজেকে চিনে ফেলেছে। আকর্ষণ সহানুভূতি, দয়া, মায়া তার জীবনের বিরোধী পক্ষ। সামান্য-ক্ষণের জীবন প্রবাহ তাকে দিয়েছে মারাত্মক অভিজ্ঞতা। বাকী জীবনের চলার পথে এইটুকুই তাকে আঁধার সরিয়ে আলো দেখাবে।

এবার অচেনা পথে ধ্বনিত হতে লাগলো লেফট্ রাইট্, লেফট্ রাইট্ ··। বুটের আওয়াজে, চলার গতিতে জমতে লাগলো অভিমান, ক্ষোভ আর ব্যর্থতা।

ছুটো মিনিটও কাটেনি হঠাৎ ঐ হিমেল বোলপুরের মিশকালো অন্ধকারের বুক চিরে শোনা গেল এক নারী কণ্ঠ। অ-শো-ক দা—! দাঁ—ড়া—ও!

মিলিটারীর গতি শ্লথ হলো। তাকে কে যেন ডাকছে। একি দেবীর ডাক! কেন, কোন প্রয়োজনে? এত অহঙ্কার, দম্ভ ও স্ব-নির্ভরতার জোয়ারের মাঝে হঠাৎ ভাটা পড়লো কেন? শেষ ছোবলটুকু মারতে সে কি আসছে অশোকের সামনে! না, সে থামবে না। থেমে পিছু হেঁটে যাবে না সে দেবীর পাশে। দেবীর দিকে পিছু ফিরে দেখবেও না। দেবী যা বলতে চায় কাছে এসে বলুক,-- সে কোনো কথা বলবে না। দেবী যেমন খুশী ব্যবহার করুক—সে কোন প্রতিবাদ জানাবে না।

দামী কাশ্মিরী শালখানা আর পুরো আঁচলটা পুঁটুলী পাকিয়ে বুকে চেপে ধরে দেবী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসে দাঁড়ালো একেবারে অশোকের সামনে। তারপর মুখটা ঈষৎ ফাঁক করে, আলতো করে ঘাড় ছুলিয়ে আপন মনে হাঁফাতে লাগলো। ওঠানামা করতে করতে ওর হৃৎপিণ্ডটা এবার বোধহয় ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

অশোক গম্ভীর। ছুচোখে তার অবসাদ মাখা। সে একদৃষ্টে চেয়ে রইল কুড়ি বছরের সুন্দরী দেবীর মুখটা লক্ষ্য করে।

আরও ছুবার দম নিলো দেবী। ধীরে অশোকের বাঁ বাহুটা

জড়িয়ে ধরে বললো, তুমি চলে যাচ্ছো অশোকদা। উঃ। ছোটবেলাকার সেই রাগ এখনও আছে তাহলে। যদি অপরাধ করে থাকি তাহলে যত পারো শাস্তি দাও। দোহাই তোমার, আমায় ভুল বুঝো না। আমার সাথে দেখা না করে এমনি করে চলে এলে কেন?—কথা বলো? বলো—কিছু একটু বলো।—সারাদিন তোমার অপেক্ষায় বাড়ীতে বসে রইলাম, এলে না। বেয়ারাকে পাঁচটাকা বখশিস দিয়ে সজাগ রেখে ছিলাম। আমি জানতাম তুমি কলেজে আসবে। বলেছিলাম মিলিটারীর মত কাউকে দেখলে খবর দিবি। ভিতর থেকে দেখলাম তুমি বেয়ারার সাথে কথা বলছ। তোমায় দেখে যে কি আনন্দ হয়েছিল তা বোঝাতে পারব না। কিন্তু আমার কি এমন অপরাধ যে তুমি একখানা গান গাইবার সময়টুকুও অপেক্ষা করতে পারলে না?

যাক্, তোমার সাথে দেখা করার সাধ আমার মিটেছে। যাও যেভাবে যেখানে খুশী চলে যাও। তোমরা পুরুষ, তোমাদের রাগ আছে, দম্ভ আছে, স্বাধীনতা আছে। আমার ভিক্ষা শুধু একটা মিনিট দাঁড়াও। প্রণামটা সেরে নিই। দেবী বোধ হয় কাঁদছিল। না কাঁদলেও গলার আওয়াজে কাঁদো কাঁদো ভাব নিশ্চয় ছিলো।

অশোক দু-হাত বাড়িয়ে দেবীর কাঁধটা ধরে তুলে বললো,—একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে দেবী। আসলে ট্রেণ ধরবার সময় হয়ে গেছেতো। তাই এত তাড়াহুড়ো। আমায় এক্ষুণি যেতে হবে। যাবার আগে শুধু একটা প্রশ্ন করতে চাই।—বলো সত্য উত্তর দেবে।

একটু মুচকি হেসে দেবী বললো, প্রশ্নটা আগে শুনি।

—তুমি আমার কথা মনে রেখেছ? মানে ছোটবেলাকার সব কথা তোমার মনে আছে?

—আছে। কিন্তু মনে রেখে লাভ কি বলো?

—ঠিকই বলেছো, আমি চলি।

এমনি করে যদি চলেই যাবে তাহলে চিঠি দিলে কেন?—এলেই

বা কেন ?—চলে যেতেই যদি এসে থাক তাহলে ঠাকুমার জপমালায় গাঁথা হয়ে আছ কেন ?

—ঠাকুমার জপমালা ?—তোমার জপমালায় গাঁথোনি !—বলো, চুপ করে রইলে কেন ?

—জানিনা, যাও !

—আমায় ভুল বুঝো না দেবী, আমি আবার আসব।

—আমায় কথা দাও। আমায় ছুঁয়ে বলো।—এসে থাকবে তো ?

কথা দিলাম। তোমায় ছুঁয়ে বলছি, আসবো, আসবো। আর তোমার সাথে অনেক গল্প করব।—আসি তাহলে !

—একটু দাঁড়াও, বিদায় দেবার প্রণামটা সেরে নিই, কিন্তু তা আর হলো না।

পাশের একটা দেওয়ালের পাশ থেকে হঠাৎ এক লাফে বেরিয়ে এলেন দেবীর গানের মাষ্টার অরূপবাবু। গম্ভীর অথচ হাল্কা সুরে তিনি বললেন, অদ্ভুত সুন্দর গেয়েছো দেবী। যেমন দরদ—তেমনি দরাজ। তোমার গলায় এত সুন্দর গান আগে কখনোও শুনিনি তো। ফার্ষ্ট প্রাইজ তোমার বাঁধা। এক্ষুণি রেজাল্ট আউট হবে। —চলো, যাবে না ?

—যাচ্ছি। দেবী নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, আসুন পরিচয় করিয়ে দিই। এই হচ্ছে অশোক দা, আর ইনি আমার গানের মাষ্টার মশাই অরূপ ব্যানার্জ্জী।

নমস্কার বিনিময়ের পরই অশোক বললো,—চোদ্দ বছর আগে আমরা ওদের ভাড়াটে ছিলাম। তখন আমি ন' বছরের, দেবী ছিল এতটুকু,—ছ' বছরের।

—দেবীকে আমি গত সাত বছর ধরে গান শেখাচ্ছি। আমার কাছেই ওর হাতে খড়ি। আমি অবশ্য এখন ঠিক আর মাষ্টার নই, মানে, বাড়ীর আর পাঁচজনের মত আমিও ওদের একজন ফ্যামিলি মেম্বার হয়ে গেছি।

অশোক বললো, ছোটবেলায় ঠাকুমার পাকা চুল তোলা, মন্দিরে

নিয়ে যাওয়া, দোক্তা কিনে আনা সব আমিই করতাম। সে সব কথা তোমার মনে আছে দেবী ?

প্রশ্নের উত্তরে অরূপবাবু বললেন, ওসব কি আর ওর মনে আছে ?—ছোটবেলায় আমরা কাঁচা পেয়ারা, আমড়া, আর কাঁচা আম চিবিয়ে খাই, বড় হয়ে সে সব ছাই পাঁশ খেতে কি আর কারও ভালো লাগে ? তারপর একবার নস্যি টেনে নিয়ে বললেন, বেশ মেঘ করেছে। এই ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে আর কথা নয়। ঠাণ্ডা লেগে গাল, গলা ফুললে তোমার ঠাকুমা এই লোকাল গার্জেনের গলা কেটে ফেলবেন।

এবার যাও দেবী, তোমার গার্জেনের ডাক অমান্য কোরো না ধীরে বললো অশোক।

—করা উচিত নয়। হয়তো জানেন না ওর ঠাকুমা ওকে আমার সাথে ভিন্ন অন্য কারো সঙ্গে ছাড়ে না। আপনি নেহাত এককালে ওদের ভাড়াটে ছিলেন, সেই সুবাদে আপনার সাথে ওকে একটু কথা বলতে দিলাম। যাক্ চলি ভাই, চলো দেবী দেরী হয়ে যাচ্ছে যে !

যাবার জন্য দেবী পিছু ঘুরছিলো হঠাৎ অশোক বললো, থামো দেবী। একটা কথা বলতে বাকী আছে।

—বলো। দেবী ঘাড় তুলে চেয়ে রইল।

—বলুন তাড়াতাড়ি বৃষ্টি এলো বলে, বললেন মাষ্টার মশাই।

অশোক কথাটা ছুঁড়ে দিল দেবী আর মাস্টার মশাই এর ঠিক মাঝের ফাঁকটায়। বললো, দেবী যখন এসেছিল তখন কিন্তু গার্জেন সঙ্গে আসে নি। ও যখন আমার সাথে কথা বলছিল তখন তার গার্জেন লুকিয়ে ছিল ঐ দেয়ালের আড়ালে। মজার ব্যাপার হলো ফিরে যাবার সময় মাষ্টার হঠাৎ অভিভাবক সেজে তাড়া দিতে শুরু করেছে। দেবী তো একাও ফিরতে পারত। আমিও তো তাকে একটু এগিয়ে দিতে পারতাম।

অরূপবাবু চটে উঠলেন। বললেন আপনার মতো এক অচেনা, অজানা মিলিটারীর সাথে দেবীর এইভাবে আলাপ করা ভীষণ দৃষ্টিকটু।

এছাড়া আপনাকেও বলি ভবিষ্যতে দেবীকে আর তুমি বলে সম্বোধন করবেন না।

—কারণটা জানতে পারি কি ?

—নিশ্চই পারেন। আসল কারণটা না জানিয়ে পারলাম না। আর ঠিক দেড় মাস পরেই দেবীকে আমি বিয়ে করছি। ও আমার বাগদত্তা। পনেরোদিন পরেই আমাদের আশীর্বাদ। কথা শেষ করে মাষ্টারমশাই নস্যি টানলেন।

সুন্দর খবর! সদ্য ফোটা ফুলের ওপর বসেছে ভীতিকর কদাকার এক আরশোলা!

আশ্চর্য লাগছে এই দেখে যে ঐ হাড় জিরজিরে চল্লিশ বছরের বৃদ্ধ কঙ্কালটাকে টেনে নিয়ে আপনি যাবেন কুড়ি বছরের ঐ ফুটফুটে মেয়ে দেবীকে বিয়ে করতে।– বর সাজতে আপনার লজ্জা করবে না?

– লজ্জা করবে কেন? আমার বয়স মোটেই চল্লিশ নয়, বত্রিশ। আমার পেটের গোলমালের জন্য চেহারাটা এমনি বুড়োটে দেখায়

—বত্রিশ! পেটের গোলমাল! আসলে আপনার মাথারও গোলমাল! একটা ব্যাপার কি জানেন—আমাদের দেশে যত রাজ্যের পড়ার মাষ্টার, গানের মাষ্টার, সেলাই, গীটার, সেতার এমনকি আঁকার মাষ্টাররা তাদের ছাত্রী ছাড়া আর কাউকে বউ ভাবতে পারে না। আপনারা হচ্ছেন মাষ্টার নামের কলঙ্ক। এখানে থাকলে আমি এ বিয়েতে বাধা দিতাম—মাষ্টারদের এই ছাত্রী ধরার নগ্ন-ফাঁস ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ছাড়তাম। এই ধরণের বিবাহ একটা দুষ্ট ক্ষুধা, সমাজের এ একটা বিষাক্ত ক্ষত। যাক্ আমি চললাম, কিন্তু দেবী, খুব সাবধান। আর যাই কর না কেন, ঐ স্বার্থপর, কুটিল, কু-নীতিপরায়ণ বৃদ্ধকে কখনোও বিয়ে কোরো না। উনি তোমাকে সিঁদুর পরা রাঁধুনি সাজিয়ে বাড়ীতে বন্দী করে রাখবেন। তারপর ঐ গিলে করা ধুতী পাঞ্জাবী ঝুলিয়ে আরও পাঁচটা বাড়ীর লোকাল গার্জেন সেজে······

চুপ করো অশোকদা—দেবী ঝাঁপিয়ে পড়ে অশোকের মুখটা চেপে

ধরল। বললো, ছিঃ ছিঃ সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে আমায় মাঝখানে রেখে তোমরা দেখছি লড়াই শুরু করে দিয়েছো! এবার হবে হাতাহাতি।

অরূপবাবু বেশ অশান্ত হয়ে তাড়াতাড়ি নস্যির কৌটোটা বার করে আর এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে দেবী। একটা ইডিয়ট, লোফার, গুণ্ডাকে ডেকে এনে তুমি যে আমাকে এইভাবে অপমান করাবে তা জানতাম না। আমি চললাম। শুধু শুনে নাও তুমি এখানে না থাকলে ওকে আমি খুন করতাম। রুমাল বার করে নাক মুছতে মুছতে অরূপবাবু হেঁটে চললেন কলেজের দিকে।

মাষ্টারমশাই-এর গতি লক্ষ্য করলো দেবী। ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো অশোকও মিলিটারীর গতিতে হেঁটে চলেছে ষ্টেশনের পথে। দেবী দাঁড়িয়ে রইল একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থায়। রাঙা মাটীর দেশ বীরভূমের শীতের কন্‌কনে ঠাণ্ডাকে উৎসাহ দিতে শুরু হলো প্রবল বৃষ্টি। এক মুহূর্তে বোলপুর হয়ে উঠলো দার্জিলিং।

দেবী ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালো। তার ডানদিকে কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিতে এগিয়ে চলেছে অশোকদা, অন্যদিকে চলেছে ঠাকুমার আদরের মাষ্টারমশাই। দেবী জীবনে এমনভাবে বৃষ্টির জলে কখনোও ভেজেনি। তার চাদর শাড়ী চুল—সর্বাঙ্গ স্নানে মেতে উঠলো মহাউল্লাসে।

অশোক ঝড় তুলে হেঁটে ষ্টেশনে এসে ঝিমিয়ে পড়লো। বাংলার ট্রেণ সার্ভিস যে এত বেরসিক তা সে আজই প্রথম বুঝলো! তার ট্রেণটা আসতে সাড়ে তিন ঘণ্টা দেরী। এতখানি সময় সে কিভাবে কাটাবে? অশোক প্ল্যাট্‌ফরমের একটা খালি বেঞ্চে বসে দেবীর কথা ভাবছিলো।—এই অন্ধকার ভরা ঝড় বৃষ্টির রাতে দেবীকে একা ছেড়ে আসা উচিত হয়নি। এ তার অন্যায়। সে কর্তব্যহীনতার পরিচয় দিয়েছে·······

—একি পায়ের কাছে! সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সে দেখল কে যেন তাকে প্রণাম করছে!

কাঁপা ঠোঁটে কোনমতে দেবী বলল বিদায়ের প্রণাম করতে এলাম।

———

রাঙামা

মিতা—মিতা—মিতালী, চীৎকার করে ডাকলেন অমলবাবু।

বাহান্ন বাজার, তিপান্ন গলির চন্দ্রকোণা শহরে এক বন্ধুর বাড়ীতে সস্ত্রীক বেড়াতে এসেছেন অমলবাবু। এই শহরের অতীতের আকর্ষণ এখন আর নেই। রাস্তার ধারে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে ভাঙা, পোড়ো, চূণ-বালি খসা, জঙ্গলভরা বাড়ী। প্রাচীন রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ হেলে পড়েছে বয়সের ভারে। বহু দেবালয় ফাঁকা। দেবদেবী মন্দির ছেড়ে স্থান নিয়েছেন উদ্বাস্তু শিবিরে। পূজারীরা নির্বংশ হয়েছেন। লালজী আর রঘুনাথজীর মন্দিরে অবশ্য এখনও অনেকে ভীড় করে। এছাড়া শিবরাত্রির সময় খুব জাঁকজমক উৎসব হয় মল্লেশ্বর আর উজ্জ্বনাথ শিবকে কেন্দ্র করে।

জাহাঙ্গীরের সময় এখানে রাজত্ব করতেন স্বাধীনরাজা চন্দ্রকেতু। তাঁতী প্রধান এই শহর। রাজার নামেই হয়েছিল চন্দ্রকোণা। মজার ব্যাপার, চন্দ্রকোণার ভিন্ন ভিন্ন পাড়ার নাম ঠিক গ্রামের নামের মত। এক পাড়ার নাম নরহরিপুর, অন্যটির নাম গোবিন্দপুর এমনি একটি পাড়ায় সেদিন অপরাহ্ণে অমলবাবু বেশ বিপদে পড়ে গেলেন।

তিনি আবার চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন, মিতা—মিতালী··· চিৎকারকে ভেংচি কাটল প্রতিধ্বনি।

এক্ষুণি আসছি বলে মিতালী রাস্তার ধারে একটা ঝোপঝাড় ভরা ভুতুড়ে বাড়ীতে কিজন্যে যেন ঢুকেছে! অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে অমলবাবু এবার বেশ চিন্তায় পড়েছেন। সাপ ব্যাঙভরা ঐ বাড়ীর ভিতরে না ঢুকে স্ত্রীকে আরো দু-বার ডাকলেন। কোন উত্তর না পেয়ে অবশেষে ঢুকলেন বাড়ীটায়। সাবধানে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে খোঁদা গর্তওয়ালা বারান্দায় উঠলেন। দেখলেন, নির্জন

পরিবেশকে আরও নিস্তব্ধ করতে মিতালী নিজের ঠোঁটে তর্জনী চাপা দিয়ে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছে।

—অদ্ভুত মানুষ তো তুমি! —এখানে কি করতে এসেছো?

—চুপ! বলছি! দুধ উথলে যাবার আগেই যেন ষ্টোভটা নিভিয়ে দেওয়া হলো। পরে ইশারায় স্বামীকে ডেকে মিতালী এক পা এক পা করে এগিয়ে চললো ভিতরে। যেন যখের ধনের সন্ধান পাওয়া গেছে।

একটা, ··দুটো ঘর পেরিয়ে ওরা ঢুকলো তৃতীয় ঘরটায়। ঝুল, নোংরা, চামচিকে ভরা ঘর। দেওয়াল, জানালা দরজা—সবই ভাঙা। ঘরের ছাদ ফাটা। ফাটা ছাদের উত্তর কোণে একটা বড় ফুটো। ফুটোর ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে অস্তগামী সূর্যকে। আঙুল বাড়িয়ে মিতালী কি যেন দেখালো!

অমলবাবু ঝুঁকে দেখলেন ঘরের পশ্চিমকোণে কে একজন মুড়ি দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে।

—কে এটা? ধীরে ঠোঁট নাড়লেন অমলবাবু।

—একটা ছোট ছেলে। ফিসফিসিয়ে মিতালী বললো, বড় মিষ্টি দেখতে। ওর কথা তোমার বন্ধুর স্ত্রী সব বলেছে। তার কথা মতোই এসেছি ওকে দেখতে।

—দেখে কি লাভ তোমার?

—একে নিয়ে গিয়ে মানুষ করবো। লক্ষ্মীটি, অমত কোরোনা।

—দাঁড়াও ডাকি ওকে।

—না গো, বেচারী ঘুমুচ্ছে। এখন ডেকোনা।

—এটা কি ঘুমোবার সময় নাকি?

সামনের দিকে ঝুঁকে ছেলেটির গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা দিলেন অমলবাবু।

ছেঁড়া, ময়লা চাদরটা মুখ থেকে সরিয়ে ছেলেটি চমকে উঠল ওদের দেখে। মুখে তার এক রাশ জিজ্ঞাসার চিহ্ন। হাই তুলে চোখ কচলে শেষে শরীরে মোচড় দিয়ে তক্ষুণি সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো।

—তোমার নাম কি ?—শোনো, চলে যেওনা। তুমি এখানে থাকো কেন ? তোমার মা, বাবা কোথায় ? কাতর কণ্ঠে মিতালীর আর্তনাদ।

উঠান পেরিয়ে ছেলেটি ধীরে নামলো রাস্তায়। চন্দ্রকোণার বাতাসে নেমেছে শিরশিরে ঠাণ্ডা। বারোতুয়ারী নামে ভাঙা তুর্গটায় তখন আঁধার নেমেছে।

ছেলেটিকে নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুললো স্বামী আর স্ত্রী।

অবসন্ন, ঝিমানো, কাঁচা ঘুমভাঙা দেহটাকে নিয়ে নিজের অজান্তে ছেলেটি থমকে দাঁড়াল।

মিতালী একরকম ছুটে গিয়ে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসে ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে বললো, তোমার কোন ক্ষতি করবো না সোনা, বলোনা তোমার নাম কি ?

মিতালী কণ্ঠে আরও দরদ ঢেলে মিষ্টি সুরে প্রশ্ন করলো, বলোনা তোমার নাম কি ?—তোমার মা বাবা কোথায় ?

মায়াভরা কাতর দৃষ্টি মেলে ছেলেটি মিতালীর মুখের দিকে চেয়ে ধীরে ঘাড় নাড়ল। —যার অর্থ, জানিনা।

—মা বাবা নেই তোমার ?

আবার মাথা নেড়ে ছেলেটি জানালো। —না।

—তোমার নাম কি ?

—হারু।

হারু! বাঃ! বেশ নাম তো! তুমি আমার সঙ্গে যাবে হারু ? তোমাকে কলকাতায় নিয়ে যাব, লেখাপড়া শেখাব।

—মুই লেখাপড়া জানি। ঘাড় হেলিয়ে বললো হারু।

—জানো ? বাঃ! আমি আরও শেখাব, অনেক শেখাব। তোমার তো মা নেই, আমি তোমার মা হব। যাবে হারু ? আমি তোমায় কোন কষ্ট দেব না।—কি, কিছু বলছ না কেন ? তোমায় খুব আদর করব। লক্ষ্মী সোনা, যাবে আমার সঙ্গে ?

হারু ঘাড় তুলে করুণ স্বরে বললো, মোকে মারবে না ? ভালোবাসবে ?

মিতালী হারুকে জড়িয়ে ধরে ওর ছোট্ট কচি গাল ছ'টোতে চুমু খেতে খেতে বললো, নারে পাগলা ছেলে, মারব না, ভীষণ ভালোবাসব।

* * *

চন্দ্রকোণা ছেড়ে কলকাতা এসে হারুর চলা বলা কাজকর্ম সবই দ্রুত পাল্টে গেল। মুই, মোকে কথাগুলো ছেড়ে শিখলো আমি, আমাকে। ছেঁড়া ইজের, গেঞ্জী ফেলে পেল জামা, প্যাণ্ট, জুতো, মোজা। হারানো সন্তান, তাই আগের নাম ছিল হারু। এখন তার নতুন নাম হলো মিলন। দোতলা বাড়ীতে পেল একটা আলাদা ঘর, খাট, বিছানা, আলমারী। ভর্তি হলো ইস্কুলে। প্রাইভেট পড়ানোর জন্য মাষ্টার রাখা হলো বাড়ীতে। মিতালীকে সে রাঙামা এবং অমলবাবুকে, বাবু বলে ডাকতে আরম্ভ করলো।

কয়েক দিনের চেষ্টায় অমলবাবু মিলনের কাছ থেকে জেনে নিলেন তার অতীতের ইতিহাস। এমন সুন্দর ফুটফুটে একটি ছেলের বংশ পবিচয় ও জন্ম রহস্য জানার জেদ চেপে উঠলো তার মাথায়। তাই সব কাজ ফেলে তিনি মেদিনীপুর জেলার কয়েকটা জায়গায় ছুটলেন। অনুসন্ধান পর্ব শুরু হলো।

প্রথমেই তিনি হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেণে চেপে ষোল মাইল দূরে পাঁশকুড়ায় নেমে আরও ষোল মাইল বাসে করে গেলেন তমলুকে। ঐখানের একটা স্কুলে পড়ত হারু। স্কুলের এক বৃদ্ধ শিক্ষক জীতেন-বাবু হারুর ব্যাপাবে অনেক খবর দিলেন।

—আচ্ছা, জীতেনবাবু! হারুকে এই স্কুলে কে কোথা থেকে নিয়ে এলো বলতে পারেন? অমলবাবু প্রশ্ন করলেন।

—কোথা থেকে জানিনা, তবে এই স্কুলেরই এক শিক্ষক হীরেণ-বাবুই ওকে এনেছিলেন। বড় সৎ ও মহৎ ছিলেন ঐ শিক্ষকটি। একে সামান্য বেতন তার ওপর ওনার ছিল আটটি ছেলে মেয়ে। আরে মশাই কথায় বলে না, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়— আবির আনতে দোল শেষ! দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত ঐ মানুষটি হঠাৎ

কোথা থেকে যে হারুকে আনলেন, তা কেউই জানে না। তবে হাঁ হারু ছেলেটি সত্যিই ভালো। রূপে গুণে বিদ্যা বুদ্ধিতে সে ছিল ক্লাসের সেরা ছেলে। একবার জানতে আগ্রহ প্রকাশ করে হীরেনবাবুকে প্রশ্ন করেছিলাম,—এতগুলি সন্তান নিয়ে যেখানে অনশনে কাটাচ্ছেন সেখানে আরও একটি জোটালেন কেন? এতো দেখছি, 'আপনি খেতে ঠাঁই পায়না শঙ্করাকে ডাকে।'

—ঠিকই বলেছেন আপনি। দরিদ্রের বেশী সন্তান মানে, হয় তারা মূর্খ, দুরাচারী, কিংবা অপরাধ প্রবণ হয় নতুবা রোগ, শোক, দুঃখ, দৈন্য, দুশ্চিন্তায় ও অনাহারে তারা মরে তিলে তিলে। এত বংশ বৃদ্ধির প্রয়োজনটা কিসের? (ছেলের দেহের পুষ্টির জন্য উপযুক্ত খাদ্য ও মনের স্ফূর্তির জন্য উপযুক্ত শিক্ষার সংস্থান না করে সন্তান প্রজনন করা যে একটা নৈতিক অপরাধ।) এ অপরাধ সেই হতভাগ্য বংশধরের প্রতি তো বটেই, সমাজের প্রতিও বর্তায় বললেন অমলবাবু।

—সে কথা বলবেন না। তার বক্তব্য কি জানেন? 'কেরোসিনে আত্মহত্যা করে বহুজন, কিন্তু তাই বলে কি বাড়ীতে কেরোসিন রাখবো না?' আগুন বহু বাড়ী ভস্মীভূত করে। কিন্তু কই, আগুনকে আমরা বয়কট করি না তো!

কথা বলতে বলতে ওনারা তমলুকের বর্গভীমার মন্দিরের সামনে এসে হাজির হলেন। জীতেনবাবু বললেন, আগে এই দেবীর নাম ছিল বর্গীভীম। বর্গীরা এই ভয়ঙ্কর মূর্তিকে ভীষণ ভয় করত। সুলেমানকর রানীর সেনাপতি কালাপাহাড় এই মন্দির ধ্বংস করতে এসেছিল। নিজের তরবারি দিয়ে মন্দিরের এই বিগ্রহকে আঘাত করার মুহূর্তে কালাপাহাড় দেখল সামনে যেন দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর গর্ভধারিণী মা। বিগ্রহকে অক্ষত রেখে ভয়ে কালাপাহাড় ফিরে গিয়েছিল। ···এ মূর্তিটি কার তৈরী বলা মুস্কিল। কেউ বলে এটি তৈরী করেছিলেন ধনপতি সওদাগর, কেউ বলে কৈবর্ত কালভূইঞা, আবার অনেকে বলে স্বয়ং বিশ্বকর্মা। এই ভয়ঙ্কর দেবী মূর্তির মুখে কিন্তু সদা হাসি। মূর্তি যেন জাগ্রতা আর জীবন্ত। চতুর্ভুজা, মুণ্ড

মালিনী, জটিলা এই দেবীর চার হাতে আছে ত্রিশূল, খড়্গ, খর্পর ও মুণ্ড।

ফেরার পথে অমলবাবু বললেন মেদিনীপুরের সব কিছুই ভয়ঙ্কর। সবচেয়ে বেশী ভয়ঙ্কর এখানের মানুষ। বার্জ, ডগলাস ও পেডি নামের তিনজন সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই মেদিনীপুরেই গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এই মেদিনীপুর ছিল সাহেবদের কাছে আন্দামান। মানে দ্বীপান্তর।

দু'পাশেব পানের বরজের শোভা দেখতে দেখতে অমলবাবু তমলুক ছেড়ে, গেলেন মেদিনীপুব শহরের উত্তর প্রান্তে হবিবপুরে। শুনলেন এইখানেই বিপ্লবী ক্ষুদিরামের বাস্তুভিটা। জীতেনবাবুর নির্দেশ মতো অমলবাবু হীরেণবাবুর সাথে দেখা করলেন।

হবিবপুরে হীরেণবাবুর মাসীর বাড়ী। এখানেই আছে খুব জাগ্রতা সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির। জনশ্রুতি আছে এইখানেই বামাচারী তান্ত্রিক পঞ্চমুণ্ডি আসনে বসে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। বহু দুরারোগ্য রোগ সারাতে বহুলোক এখানে আসে। মানসিক করা, ধর্ণা দেওয়া, তুকতাক ও ঝাড়ফুঁক করা প্রথায় এখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

হীরেনবাবুর সাথে আলাপ করে অমলবাবু হারুর ব্যাপাবে অনেক প্রয়োজনীয় খবর যোগাড় করলেন। কলকাতা ফেরার পথে তিনি শহরের জগন্নাথ মন্দির দেখতে ভুললেন না।

গঙ্গা বংশীয় কোন উৎকল রাজা পুরানো মন্দির প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন। কাঁসাই নদীর প্রতি বছরের বন্যার দাপট সেই মন্দির ধ্বংস করেছে। গত একশ বছর হল বর্ত্তমানের মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছেন শহরের বড়বাজারের মহাজনেরা। পরপর পীর লোহানির সমাধিক্ষেত্র, মীর বাজারের হনুমান মন্দির, বর্গীদের আমলে তৈরী শীতলা মন্দিরএবং বিবিগঞ্জের দুর্গামন্দির দেখে তিনি কলকাতা ফিরলেন তিনদিন পরে।

অমলবাবুর মুখে হারুর ব্যাপারে সমস্ত রকম খবর পেয়ে মিতালীর খুব আনন্দ হলো সত্য, কিন্তু এতগুলো উল্লেখযোগ্য স্থানে স্বামীর সঙ্গিনী হতে পারেনি বলে দুঃখও কম পেল না। অবশ্য তার মনে

কোন আফ্‌শোস থাকার কথা নয়। সে তো মেদিনীপুরের বহুস্থান ঘুরেছে। নিজের ও স্বামীর পূণ্যার্থে সে স্নান করে এসেছে ভুরভুরি কেদারকুণ্ডে। স্নানান্তে আকুল হয়ে সে ঠাকুরকে প্রার্থনা জানিয়েছে অন্তর দিয়ে। সৃষ্টির প্রভাতে সন্তান-মুখ-দর্শনাকাঙ্খিনী নারীর ভগবানের কাছে একমাত্র প্রার্থনা—হে ভগবান হয় সন্তান দাও না হয় মরণ দাও। সেই প্রার্থনা সত্যিই আজ পূরণ হয়েছে।

মিলনকে পেয়ে মিতালীর সংসারে এসেছে এক নতুন খুশির বন্যা। বহু টিপ্পনী, গঞ্জনা, অপবাদ ও সমালোচনা সহ্য করে এতদিন সে যদিও সত্য-নিষ্ঠার সঙ্গে সংসার করছিল, কিন্তু আজ মিলনকে সন্তান হিসাবে পেয়ে তার মত স্ত্রীলোকের জীবনে এসেছে চরম সার্থকতা এবং তাদের দাম্পত্যে এসেছে সত্যিকারের পরিপূর্ণতা।

দু-বছর আগের মিলনের সঙ্গে—আজকের মিলনের তফাৎ হচ্ছে আকাশ পাতাল। আদরের ঘরের দুলালের মত, ধনীর একমাত্র সন্তানের মত সব রকম যত্নে মানুষ হচ্ছে সে। তার রাঙামার নয়নের মণি হয়ে সারা সংসারে এনেছে এক আনন্দের জোয়ার।

বাড়ীতে পড়াতে এসে মাষ্টার মশাই মন প্রাণ দিয়ে তাকে শিক্ষা দেন। মাষ্টার মশাইকে নিজের লোক ভেবে মিলন প্রায়ই এই বাস্তব জীবনের নানা রকম জটিল প্রশ্ন করে। মাষ্টার মশাই মুচকি হেসে রোজই বলে যায় এসব প্রশ্নের উত্তর মাকে জিজ্ঞাসা কোরো।

সেদিন ঘটলো এক মজার ঘটনা। মাষ্টার মশাই চলে যেতেই মিলন এসে বসল মিতালীর কোলের কাছে। আচ্ছা রাঙামা—তোমায় আমি রাঙামা বলে সব সময় ডাকি কিন্তু বাবুকে রাঙাবাবু বলিনা কেন ?

মিতালী চমকে উঠলো। কোনমতে মুখে হাসির রেখা টেনে আরও বেশী করে আদর করে বললো, ওরে পাগলা ! এবার থেকে তাহলে তোর বাবুকে রাঙাবাবু বলেই ডাকিস্‌।

—আচ্ছা রাঙামা ; মিলন আবার কিছু বলতে চাইল।

—বলো বাবা ! মিতালী আগ্রহ প্রকাশ করলো।

তুমি আর আমি এ বাড়ীতে থাকি কিন্তু কোনদিনও রাতে

রাঙাবাবু এখানে থাকে না কেন? গাড়ী করে চারিদিক ঘুরে এসে আমাদের নামিয়ে দিয়ে চলে যায়। রাতে কোথায় থাকে গো? মাষ্টার মশাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন, তোমার কাছে জানতে।—বলো না রাঙামা!

মন্ত্রমুগ্ধের মত মিলন চেয়ে রইলো মিতালীর চোখের দিকে।

শিশু নেকড়ে রক্তের স্বাদ পেয়েছে! মিতালী এখন কি করবে? মিলনের সামনে কাঠগড়ার আসামীর মত দাঁড়াল সে। মনে মনে শপথ নিল, যাহা বলিব সত্য বলিব। মনগড়া নয়, ছেলে ভোলানো নয়, আবোল তাবোল জোড়াতালি দেওয়া উত্তর নয়। মিলনকে সবকিছু বলার আগে মিতালী তার বক্তব্যের সার বস্তুটুকু মনের আনাচে কানাচে সুন্দর করে সাজিয়ে নিল।

* * * *

কলেজের পাঠ শেষ করার পরই মিতালীর বিবাহ এবং এক বছর পরই তার কপাল পুড়েছিল। সে হয়েছিল বিধবা। অভিশপ্ত বৈধব্য নিয়ে কোনভাবে তার দিন কাটছিলো। তাঁর বর্তমান স্বামী অমলবাবু একজন ধনী ব্যবসায়ী। অমলবাবু বিবাহিত। তার স্ত্রী থাকে এক বিরাট অট্টালিকায় আত্মীয় স্বজনের মাঝে। স্বামী বলে ডাকলেও আসলে মিতালী অমলবাবুর উপপত্নী। উপপত্নী হয়েও সে আসল পত্নীর চেয়ে অনেক বেশী আদর যত্নে থাকে এই বাড়ীতে।

অতীতের আরও অনেক কিছু ভেবে সে ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেল। নিজের ওপর কেমন যেন ঘেন্না হতে লাগলো। ছিঃ ছিঃ! সেসব খবর সে মিলনকে বলবে কোন মুখে? সেই ঘটনার মধ্যেই আছে ঘৃণা, পাপ, নরক। না-না, অত খবর শুনে মিলনের কোন লাভ নেই। তার চেয়ে বেশ অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে সে একটা সাদামাটা গল্প তৈরী করে মিলনকে শোনাবে। এই ভেবে একটু হেসে মিতালী বললো, এখন আমি একটু ব্যস্ত মাণিক। তুমি একটু পড়া করে এসো। সময় পেলেই তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দেব।

মিলন উঠলো না। মাকড়সার জালে আটকে যাওয়া মাছির মত

একই জায়গায় চুপ করে বসে রইল।

ব্যাপারটা বুঝতে দেরী হলো না। তাই মিতালী মুহূর্তের মধ্যে এতবড় একটা গল্পকে খুব ছোট্ট করে ভেবে নিল। তার মনে পড়লো একদিন কালীঘাটের মন্দিরের সামনে ধুতি পাঞ্জাবী পরা অমলবাবুর দেখা পাওয়ার ঘটনা। তখন উনি ছিলেন অবিবাহিত। মিতালীর চোখের সামনে ছবির মত এক একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। দুষ্টু অমলবাবু নানা অছিলায় তার সাথে দেখা করতে লাগলেন। ওদের ভাব ঘন থেকে ঘনতর হলো। ওরা দুজনে দুজনকে না দেখলে ব্যস্ত হয়ে পড়তে লাগলো। এরই মাঝে বেহিসেবী অমলবাবু মিতালীকে না জানিয়েই অন্য এক মহিলাকে বিবাহ করলেন।

আগুনে হাওয়া দিলে যা হয়! অথচ তাদের মেলামেশা বেড়ে গেল। মিতালীর বৈধব্য জীবনের মাঝে অমলবাবু হলেন মরীচিকা। পাগলের মতো হয়ে মিতালী দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়ে ছুটতে লাগলো। তার জীবন-নদীর দু'কূল ছাপিয়ে এলো ভালোবাসার বন্যা। নিজেকে নিশ্চিন্ত ভাবে সেই বন্যায় ভাসিয়ে গৃহত্যাগী হলো সে।

অমলবাবু দিলেন আশ্রয়, সাহস, উৎসাহ। যোগালেন দাস-দাসী অর্থ, অলঙ্কার। মিতালী পেল সব কিছু, পেল না শুধু পত্নী নাম।

মনে মনে গল্প তৈরী করে মিলনের দু'টি বাহু ধরে মিতালী বললো, তোমার রাঙাবাবুর দুটি বিয়ে। একজন আমি, অন্য একজন একটু দূরে থাকে। বাবু সেখানে থাকেন রাতে, এখানে থাকেন দিনে। সেই বউ হচ্ছে খুব ভীতু। তার ভীষণ ভুতের ভয়! তাই তাকে রাতে পাহারা দিতে হয়। আমারও অবশ্য ভুতের ভয় খুব, কিন্তু তুমি আছো, তাই রাতে ভয় নেই। মিতালী মিলনকে কোলে টেনে নিল।

আচ্ছা রাঙামা, রাঙাবাবু চার পাঁচদিন আসছে না কেন গো? আমার খুউব মন কেমন করছে।—রাগ করেনি তো?

ওমা! রাগ করবে কেন? তিনি তো ক'দিন হল খুব অসুস্থ।

মনে নেই অসুস্থ শরীর নিয়েও দু-দিন এসেছিলেন। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার আসবেন।

হঠাৎ দরজার কড়া নড়ে উঠলো। দরজা খুলেই মিতালী দেখলো সামনে দাঁড়িয়ে আছে অমলবাবুর ড্রাইভার।

কোন প্রশ্ন করার আগেই ড্রাইভার বললো বাবুর অসুখ খুব বাড়াবাড়ি। বাঁচার আশা নেই। বড় ডাক্তার আনতে বেরিয়েছি। ভাবলাম আপনাকে খবরটা দিয়ে যাই। কথা শেষ করে ড্রাইভার ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। কোথায় যেন বিদ্যুৎ চমকে বাজ পড়লো। কড়-কড়-কড়াৎ!

দাঁতে দাঁত চেপে দম বন্ধ করে চোখ দুটো বুঁজে, এক মুহূর্ত দাঁড়াল মিতালী। বিবেকের সামনে শক্ত করে তুলে ধরলো দাঁড়ি পাল্লা। একদিকে রাখলো সম্ভব, অন্যদিকে অসম্ভব। এক প্রান্তে উচিত অন্য প্রান্তে অনুচিত। এক পাশে লজ্জা, সমাজ, লোকভয়, সমালোচনা, হতাশা, অপমান ও দীর্ঘশ্বাস। অন্যপাশে উত্তেজনা, অনুশোচনা, আবেগ, বেদনা, অশ্রু আর কর্তব্য। ঠোটে কামড় বসিয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো সে বাইরের মুক্ত আকাশের দিকে।

ফুটন্ত জলের কেটলির ঢাকনাটা হঠাৎ যেন ছিটকে পড়লো। মিতালী একরকম ছুটে গিয়ে মিলনকে জড়িয়ে ধরে বললো বাবুর বাঁচার আশা নেই। চলো মিলন, আমরা শেষ বার বাবুকে দেখে আসব। তোমায় আমি পথ চিনিয়ে নিয়ে যাব। তোমায় সব কিছু শিখিয়ে দেব। আমাদের এক্ষুণি যেতে হবে। দেরী করলে হবে মস্ত ভুল।

একটা ট্যাক্সি ওদের নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো ত্রিকোণ পার্কের পশ্চিম দিকে একটা বড় বাড়ীর সামনে। বাড়া তো নয়, যেন রাজপ্রাসাদ। বাড়ীর ফটকে তিনজন দারোয়ান ঝিমিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা আঙুল দেখিয়ে এদের দু-জনকে ভিতরে যাবার পথ দেখিয়ে দিল। মিলনের হাত ধরে হনহন করে মিতালী চলল ভিতরে। মাত্র সাতদিন আগে অমলবাবুর কিনে দেওয়া লালপেড়ে

নতুন দামী গরদের শাড়ীখানা কোনভাবে জড়িয়েছে মিতালী। বড় চুলে একটা এলো খোঁপা, মাথায় এতখানি ঘোমটা। অচেনা, অজানা পরিবেশ। ওরা দোতলায় উঠলো। রাঙামার শেখানো মত অনেকের উপস্থিতি এড়িয়ে মিলন সোজা গিয়ে ঢুকলো রোগীর ঘরে। এক পা, এক পা করে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো রোগীর খাটের পাশে।

ঘাড় তোলা খাটে অক্সিজেন পাইপ জড়ানো হয়ে চোখ বুঁজে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন অমলবাবু। ঘরের ভিতর দু-জন নার্স। রোগীব কাছে বসে আলোচনা রত দু-জন ডাক্তার। ঘরের বাইরের বারান্দায় শোকাতুরা ক্রন্দনরতা এক মহিলাকে ঘিরে বসে আছে পাঁচ সাতজন মহিলা। ছুঁচ পড়লেও শোনা যায় এমন নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধতা। চলছে যুবকদের ফিসফিসানি, শত ঘোমটার কানা ঘুষোঘুষি আর বৃদ্ধাদের ঘন শ্বাসমাখা কাতর শ্রীহরির ডাক।

চারিদিকে সচকিত দৃষ্টি রেখে সারা হৃদয় মন জুড়ে মিতালীর স্থির সংকল্প। যেমন করে হোক্ শেষবারেব মত দেখা সে করবেই।

রাঙামার শেখানো মত মিলন গিয়ে দাঁড়ালো রোগীর খুব কাছে। কচি কণ্ঠের আবেগ ভরা ডাক সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। সে আবাব ডাকল, বাবু!

অমলবাবু ডাক শুনলেন। তার কথা বলা বারণ। তার মনে কোন উত্তেজনা আনা নিষেধ। চারিদিকে তার সদা জাগ্রত প্রহরী। কিন্তু ওই ডাক যে তার খুব চেনা। তিনি চোখ খুললেন। ক্লান্তিভরা আধবোঁজা বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে ধরলেন মিলনের মুখের উপর। তারপর দৃষ্টি ঘুরিয়ে কাকে যেন খুঁজতে লাগলেন।

মিতালী দাঁড়িয়ে ছিল দরজার চৌকাঠের ঠিক মাঝখানটায়। মুখে মিষ্টি হাসির নিরস ছোঁয়া। চোখের দৃষ্টিতে সব হারিয়ে সবটুকু নিংড়ে পাওয়ার আনন্দ। সদ্য স্নাতা, এলো খোঁপার ঘন একরাশ কালো কোঁকড়ানো চক্‌চকে চুল ছড়িয়ে পড়েছে সারা পিঠের ওপর। কপালে তর্জনী ঘোরানো লাল সিঁদুরের টিপ। সিঁথি আলো করে জ্বলছে জ্বলজ্বলে সতী চিহ্ন। সে বেপরোয়া। তার স্বামী তাকে

খুঁজছে! ভয় ভাবনা দূরে রেখে সে দেখতে এসেছে তার সাথীকে। সে কখনও এত দূরে থাকতে পারে! দ্রুত পায়ে সে এগিয়ে এলো রোগীর খাটের দিকে। কিছু বলার জন্য তার মন উদ্‌গ্রীব হলো। তার শিরা-উপশিরা, স্নায়ু-উপস্নায়ু, ধমনী, অন্তর-বাহির আজ হয়তো কঠিন বিদ্রোহ করবে! এক অদৃশ্য শক্তি তাকে ঠেলে দিল তার চির দিনের সাথীর দিকে।

অমলবাবু চিনতে পারলেন। প্রকৃতির কাতরতার সাথে মিললো পুরুষের আবেগ। দৃষ্টিতে চিনি চিনি ভাব। কিছু বলার জন্য তিনি ঠোঁট ফাঁক করলেন। দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত চমক আর চনমনে উন্মাদনা দেখা গেল। মুখ, ভ্রূ চোখ একসাথে কুঁচকে এলো। একটু ছটফটিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করলেন। তিনি কিন্তু পারলেন না। ঘাড়টা একটু তুলে আবার বালিশে লুটিয়ে পড়লেন।

দু'জন ডাক্তার রুগীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন! চারিদিকে উঠলো মৃদু গুঞ্জন। মড়া কান্নার রোল তুললো সারা অট্টালিকা, আকাশ, বাতাস আর আত্মীয় স্বজন।

মিলনের হাত ধরে—একরকম টেনে নিয়ে মিতালী ঘরের বাইরে এলো। ধরা পড়ার ভয়ে দুটো চোর যেন লুকিয়ে পালাচ্ছে। সিঁড়ির শেষ ধাপ ছেড়ে ওরা তিন লাফে গেট পেরিয়ে উঠলো দাঁড় করিয়ে রাখা ট্যাক্সিটায়। মিতালীর এখন বহু কাজ, বহু হিসাব বাকী। কি ভাগ্য! তারা ধরা পড়ে নি। সাবাস্ মিলন! শেষ দেখা দেখে মিতালী সত্যিই খুশী। সর্বহারা আজ মস্ত বড় এক ক্ষতি থেকে বেঁচেছে।

ট্যাক্সির চালক ওদের হাবভাবে সন্দেহ প্রকাশ করে বললো, 'আপনারা কি কোন বিপদে পড়েছেন? প্রয়োজন হলে জানাবেন— 'ছোট ভাই-এর মত যদি আপনাদের কোন কাজে লাগতে পারি।'

ট্যাক্সির চালককে অপেক্ষা করতে বলে বাড়ীতে ঢুকেই মিতালী মিলনকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লো। অস্পষ্ট স্বরে নিজের মনে বিড় বিড় করে অনেক কিছু বললো সে।

—রাঙামা, ডাকল মিলন।

মিতালী চিৎকার করে বললো, না! না! আর রাঙামা নয়। রাঙা রং ধুয়ে মুছে গেছে রে সোনা। এবার আমায় ডাকবি শুধু 'মা' বলে। এখন অনেক কাজ তোর বাকী। তুই ছাড়া আমার যে আর কেউ নেইরে খোকা! বিশ্বাস কর বাবা, আমিই তোর গর্ভধারিণী মা। আমিই সেই পাপিনী। কোন এক দুর্বল মুহূর্তে আমি করেছি এক মহাপাপ। ওরে বাছা, সর্বব্যাপী তেত্রিশ কোটী দেবতা সাক্ষী—সাক্ষী সূর্য, চন্দ্র কোটী কোটী গ্রহ নক্ষত্র। এতদিন লুকিয়ে কেঁদেছি, আফ্‌শোসের আগুনে নিজেকে পুড়িয়ে খাক্ করেছি। এবার আমায় বাঁচতে দে। তোকে আমি সব শিখিয়ে দেব। এবার তোর শেষ পরীক্ষা। চল্ বাবা শ্মশানে যেতে হবে। তোমায় যে মুখাগ্নি করতে হবে। তুমি ভিন্ন এ কাজ আর তো কেউ করতে পারবে না বাবা। এইটাই ছিলো তোমার রাঙা বাবুর শেষ ইচ্ছা। এতেই তিনি পাবেন মহামুক্তি, মহাশান্তি।

আবার ট্যাক্সি। এবার শ্মশান। মিতালী ঘোমটা দিয়ে লুকিয়ে দাঁড়াল শ্মশানের এক কোণে। মিলনকে একটু ধূলো-কাদা মাখিয়ে ছেড়ে দিল ডোমেদের দলে। দূর থেকে পাকা মৎস্য শিকারীর ফাৎনা লক্ষ্য করার মত মিতালী এক দৃষ্টে চেয়ে রইল মিলনের দিকে।

শ্মশানে অমলবাবুর মৃতদেহকে ঘিরে উঠেছে ক্রন্দনের প্রবল ঢেউ আর আক্ষেপের প্রচণ্ড ঝড়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে তার জীবনের সাথে মিলিয়ে অনেক আলোচনা চলছে। ধনী, দাতা, শিক্ষিত, সুপুরুষ ও নামকরা সমাজ সেবী অমলবাবু মারা গেছেন। শ্মশানে প্রচণ্ড ভীড়। চন্দনকাঠে চিতা সাজানো হয়েছে। সম্পত্তির একমাত্র ভাগীদার এক ভাগিনেয় মুখাগ্নি করতে প্রস্তুত। হাতে একতাড়া পাটকাঠি নিয়ে ভাগিনেয় দাঁড়িয়ে আছে মৃতদেহের পাশে। আশে পাশে দাঁড়ানো ছ পাঁচজন ধুতি-জামা পরা বৃদ্ধ, ভাগিনেয়কে নানা নিয়ম শেখাচ্ছেন।

মিলন সব রকম নিয়ম জেনে নিচ্ছে দূরে দাঁড়ানো রাঙামার জলভরা চোখের ইশারা থেকে।

একতাড়া পাট কাঠি জ্বালিয়ে ভাগিনেয় মৃতদেহের চারিপাশে ঘুরতে লাগলো। কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে একটা পাটকাঠি জ্বালিয়ে মিলন ঘুরতে লাগলো মৃতদেহের চারিপাশে ঘিরে দাঁড়ানো আত্মীয় বর্গকে কেন্দ্র করে। দু-বার ঘোরা শেষ হলো। মিলন রাঙামাকে একবার দেখে নিল।

তিনবার ঘোরা শেষ করে মিলন এক ফাঁক দিয়ে দ্রুত ভিতরে ঢুকে জ্বলন্ত কাঠি ছুঁইয়ে দিল মৃতের মুখে। অদ্ভুত তৎপরতা! সাবাস্ মিলন। আজ তোমার জিৎ।

শুরু হলো হৈ হৈ রৈ রৈ ধর ধর রব।

কে কাকে ধবে? রাঙামার হাত ধরে এক বকম টানতে টানতে মিলন বললো, তুমি এত আস্তে হাঁটছো কেন রাঙামা? ওরা আমায় চিনে ফেলেছে।

ষ্টার্ট দিয়ে রাখা ট্যাক্সিটায় দু-জনে ঝাঁপিয়ে ঢুকে পড়লো। চোখের নিমেষে ট্যাক্সি মিলিয়ে গেল সদা ব্যস্ত শহরের অগণিত ট্যাক্সির মাঝে।

মিতালীর বারো বছরের সাথী চিরদিনের জন্য বিদায় নিলেন। বিধাতার কি নিষ্ঠুব বিচার। এতদিন যে মানুষের হৃদয় মন ভালোবাসা নিয়ে সে ইচ্ছামত খেলা করলো, যে মানুষটিকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী সেজে এতকাল একে অপরের কাছে সুচিন্তিত ও সুনিশ্চিত সম্মতি বিনিময় করলো, আজ নিঃস্ব ভিখারিণী ও অভাগিনী সেজে সে সেই মানুষটির মৃতদেহ আঁকড়ে ধরে শোক করা তো দূরের কথা, সামান্য শোক প্রকাশের চিহ্ন স্বরূপ সমাজের কারো সামনে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলার সাহস, অধিকার বা স্বাধীনতা পেল না।

বাড়ী ফিরে মিলনকে খাটে বসিয়ে মিতালী চেয়ে রইল ছোট ছোট মেঘে ভরা আকাশের দিকে। অমলবাবুর কথা নতুন করে ভাবতে তার বেশ ভালো লাগছে। অমলবাবু বলেছিলেন, তোমায় পাওয়া মানে সব পাওয়া। চন্দ্রকোণার রাজা হরিভানু সিংহ যেমন তার স্ত্রী লক্ষণাবতীর মূর্তি গড়ে মন্দিরে দেবীর স্থানে

বসিয়েছিলেন, তোমার কথা চিরকাল মনে রাখতে আমিও তাই করবো।

হায়! সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল!

—রাঙামা!

—বলো সোনা।

—আমাকে দিয়ে মুখাগ্নি করালে কেন? মিলন প্রশ্ন করলো।

—তোমারই তো একমাত্র অধিকার। তুমি তো বাবুর একমাত্র বুকজোড়া সন্তান। আজ থেকে তেরো বছর আগে তোমার জন্মের পর বাবুর হুকুম মতো কাজ করে একটা মস্ত ভুল করেছিলাম।

—কি ভুল রাঙামা?

—শুধু কি ভুল! মহা সমস্যা, মহা চিন্তা। মনে, শরীরে, সারা সত্তায় আগুন লেগেছিল। তুই সব বুঝবি না বাবা। তোকে পেটে তো ধরেছিলাম কিন্তু তোর পরিচয়ের কথা ভাবিনি আগে। তাই করলাম মস্ত অপরাধ।

—কি অপরাধ করলে রাঙামা? বল না রাঙামা।

—বলব, তোকে সব বলব। একটা শীতের ভোরে অশ্রুজলে তোকে স্নান করিয়ে, ঠোঁটে শত চুমা দিয়ে, কনিষ্ঠায় কামড় বসিয়ে একটা ভেলভেটের কাঁথায় মুড়ে তোকে রেখে এলাম রূপনারায়ণ নদীর ওপারে কোলাঘাটের কোলে। কাঁথার ভিতর এক তাড়া একশো টাকার নোট গুঁজে দিয়ে ছিলাম। উফ্! তুই চিৎকার করে কেঁদে উঠলি। চমকে উঠলাম কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ে পালিয়ে এলাম। ধরা পড়িনি সত্য। কিন্তু বিবেকের দংশনে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে হয়েছি জর্জরিত। কেবল মনে হয়েছে আমার এই নিষ্প্রাণ শরীরটায় কে যেন অহরহ চাবুক মারছে। যেদিন ঈশ্বর আবার আমার হারানিধিকে মিলিয়ে দিলেন সেদিন অবাক হয়ে চেয়েছিলাম তোর মুখের দিকে। তোর রাঙাবাবুর মুখ বসানো তোর মুখে। গায়ের রঙও তেমনি। চোখ, নাক, চিবুক সব কিছুতেই অদ্ভুত মিল। মনে মনে সেদিন আমি আবার নতুন করে মা হলাম।

—সেই শিশু এখন কোথায় রাঙামা ?

—সে শিশু তো তুমি।

—আমি সেই শিশু ?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। বিধাতার লিখন বাবা। তোমার রাঙাবাবু পর পর বহু জায়গা ঘুরে সব খবর নিয়ে এসেছেন। নদীর কোল থেকে এক উদার প্রাণ মাতাল বৃদ্ধ তোমাকে নিয়ে গেল বৈষ্ণবদের মহা তীর্থক্ষেত্র দাঁতনের জগন্নাথ মন্দিরের কাছে। তোমার দুর্ভাগ্য তাই তার স্ত্রী হঠাৎ মারা গেল। সেই দুঃখে মাতাল বুড়ো বাড়ী থেকে কোথায় চলে গেল কেউ জানলো না।

—ঠিক বলেছো রাঙামা। আমারও একটু একটু মনে পড়ছে। আমাকে বাইরে থেকে তালা দিয়ে চলে গিয়েছিল। দুদিন এক রাত একা সেই ঘরের মধ্যে বসে বসে কেঁদেছিলাম।

—ওখান থেকে এক শিক্ষক হীরেণবাবু তোমায় নিয়ে গেল নিজের বাড়ী। বাড়ী থেকে তমলুক। সেখানে ইস্কুলে তোমায় ভর্ত্তি করা হয়েছিল। লেখাপড়া ভালোই করতে কিন্তু সেখানেও এলো বাধা। হঠাৎ কোন কারণে ঐ শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মাথার গণ্ডোগোলের জন্য তাকে ঐ স্কুল ছাড়তে হলো। তোমাকে বাড়ী থেকে বিতাড়িত করা হল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ সে কথা আমারও মনে আছে। জানো রাঙামা, আমি একদিন হীরেণকাকুর বাড়ী থেকে পালিয়ে গেলাম। কোথায় গেলাম জানো ? সেখানে রোজ আধমন চালের ভোগ দেওয়া হয় গো। ঐ যে গো বগড়ী, কৃষ্ণনগরের কৃষ্ণরায় জীউ-এর মন্দির। ওখানে আমি কাজ করতাম। কিন্তু একদিন ওরা আমাকে চোর বললো। বড্ড খারাপ ওরা। নিজেরা চুরি করে আমার নামে দোষ দিয়েছিল। তাই ওখান থেকেও পালিয়ে গেলাম।

—আহারে ! ওখান থেকে তারপর কোথায় গেলি ?

ওখান থেকে একজন ভালো লোক লেখাপড়া শেখাবে, চাকরী দেবে, মানুষ করবে বলে আমায় নিয়ে গেল। তার বাড়ী বরোদা।

ওখানে বিশালাক্ষী মন্দির আছে। টিনের চাল দেওয়া মন্দির গো। ঠাকুর স্বপ্নে বলেছেন, পাকা মন্দির বানাস্‌নি যেন। কালী ঠাকুর গো। মুখের দুদিকে দুটো নাকদন্ত আছে। ওখানেও আমাকে খুব খাটাতো। তাই আবার পালিয়ে গেলাম।

—থাক, আর বলতে হবে না বাবা। এবার তুমি কিছু খেয়ে নাও। কথা শেষ করে মিতালী মিলনকে বুকে টেনে নিল।

ধীরে আলিঙ্গন ছাড়িয়ে মিলন মিতালীর মুখের দিকে এক-দৃষ্টে চেয়ে রইল।

—কি দেখছিরে অমন করে?—কিছু বলবি?

—আচ্ছা রাঙামা, আদর মাখানো কণ্ঠে বললো মিলন।

আমাকে কি মা'বলে ডাকবি না বাবা? বল্‌—মা বল। ওরে আমি যে ঐ ডাক জীবনে কখনও শুনিনি! আমি যে তোর মা।

কোলের কাছে ঘেঁষে বসে মিলন বললো,—বউ মারা গেল বলে মাতাল দাদু আমায় ছেড়ে গেল, হীরেণকাকুর অসুখ করলো তাই কাকীমা আমাকে তাড়ালো। রাঙাবাবু মারা গেছে, তুমি আমায় হতভাগা, অলক্ষ্মী বলে কান মুলে তাড়িয়ে দেবে না তো? তোমার কাছে আমি থাকবো রাঙামা, তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না। লক্ষ্মীটি রাঙামা, আমাকে তোমার কাছেই রাখো।

মিতালীর সারা শরীর ও মনে একটা জ্বালাময় শিহরণ জাগলো। মিলনকে প্রাণপণে বুকে চেপে ধরে সে কি যেন বলতে গেল। কণ্ঠ থেকে একটা পাঁচ মিশালি গোঙানো স্বর সব কিছু বলাকে দলা পাকিয়ে দিল। দর বিগলিত ধারায় একরাশ উষ্ণ অশ্রুরাশি ঝরে পড়লো মিলনের সারা শরীরের উপর।

মিতালীর বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে মিলন বারে বারে বলে চললো, আমায় তাড়িয়ে দিওনা রাঙামা, তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না। তুমিই আমার মা,—মাগো!

মিলনের দু-চোখের ধারা নিজের আঁচল দিয়ে সস্নেহে মুছিয়ে দিতে দিতে মিলনকে বুকে টেনে নিয়ে চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিলো তার রাঙামা।

শনিবারের শিকারী

হেরে গেচিস্, ঠকেচিস্, সবই বুঝলাম, কিন্তু এমন নিশ্চল, নির্জীব, জড় পদার্থের মত ঝিমিয়ে পড়লি কেন? কলকাতার, বিশেষ করে বউবাজারের আধুনিক যুবক তুই, এসব সামলে নিয়ে, নতুন উদ্যমে দুনিয়াকে আঁচড়ে চল! এমন ছেলেমানুষী কি তোকে মানায়? বললো সঞ্জয়।

ছাঁচ আমার ভেঙ্গে চুরমার হয়েছে। এর প্রতিশোধ আমি নেবোই। কে আসল আর কে নকল—কে সত্য –কে মিথ্যা সেটুকু আমি খুঁজবো। যেমন করে হোক, এর প্রতিশোধ আমি নেবই! কথা শেষ করার আগেই পার্থ জোরে টেবিলের উপর চপেটাঘাত করলো।

কফি হাউসের দোতলায় পাতা চারকোণা শক্ত সাদা টেবিলটা একটু কেঁপে উঠলো। ছাইদানি থেকে ধোঁয়া ওড়ানো দু'টো জলন্ত সিগারেট ছিট্‌কে পড়লো মাটিতে। সদ্য দিয়ে যাওয়া দুকাপ ফুটন্ত কফি থেকে খানিকটা চলকে পড়লো টেবিলে। জলন্ত আর ফুটন্তর ছোঁয়া এড়াতে দু-বন্ধুই লাফিয়ে উঠলো চেয়ার থেকে।

ঠিক এই সময়ে বেয়ারাদের মুখে শোনা গেল গুঞ্জন। কেউ বললো খুন্ হয়েছে, কেউ বললো করোণারী এ্যাটাক কিংবা ছিনতাই। দো-তলার জানলা দিয়ে ঝুঁকে দেখলো দু-বন্ধু। উপর থেকে যেটুকু দেখা যায় তা থেকে বোঝা গেল না কিছুই। কফি হাউসের সামনের রাস্তাটায় বেজায় ভীড়। ভীড় উপচে পড়েছে ট্রামলাইনে। ঠ্যালা, অটো, বাস, ট্যাক্সি সবই উভয় দিকে থমকে দাঁড়িয়েছে। হৈ, হৈ, রৈ, রৈ, আওয়াজে হচ্ছে গোলমাল। আশপাশের ছাদে জড়ো হয়েছে হাজারো সন্দেহ। বিজ্ঞের ভঙ্গীতে অনেকে ছুঁড়ছে রকমারী প্রশ্নবাণ। যে যার খুসীমত উত্তর জুড়ে দিয়ে বহু প্রশ্নকে দিচ্ছে রুখে।

ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে সঞ্জয় হুড়মুড়িয়ে নিচে নেমে এলো। পার্থও পিছু নিলো। এক লাফে রাস্তায় নেমে ওরা ভীড় ঠেলে এগিয়ে এলো একটা ট্যাক্সির দিকে। ঐ ট্যাক্সির ভিতরই ঘাড় কাত করে, শরীর এলিয়ে দিয়ে শুয়ে আছেন একজন ভদ্রমহিলা। সম্ভ্রান্ত, রূপবতী, সুদর্শনা, স্বাস্থ্যবতী তিনি। পরনে দামী আকাশি রং-এর চওড়া লালপেড়ে শাড়ী। সিঁথিতে জ্বলজ্বল করছিলো মোটা করে টানা সতীচিহ্ন। যেন পঞ্চাশে পা দেওয়া জমিদার গিন্নী।

—ট্যাক্সির কাছাকাছি এসেই পার্থ সঞ্জয়ের একটা হাত চেপে ধরে বলল, প্লিজ, তুই ওখানে যাসনি, তোকে কিছুতেই যেতে দেব না ওখানে!

—এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সঞ্জয় বলল, যাব না কেন? মায়ের বয়সি এক অসহায়া ভদ্রমহিলা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তুই আমায় ওখানে যেতে বাধা দিচ্ছিস কেন?

—অসুস্থ মোটেই নয়। ঐ দেখ্, একজন মগে করে জল নিয়ে পৌঁছে গেছে। এসব ঝামেলায় তুই যাস্‌না।

সঞ্জয় দেখলো, একজন ফিট্‌ফাট্ কোর্টপ্যান্ট পরিহিত যুবক মগ থেকে জল নিয়ে মহিলার ঘাড়ে চোখে মাখিয়ে দিলো। মহিলা মুহূর্তের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠলেন। সদ্য ঘুমভাঙ্গার ভঙ্গিমায় ঘাড় তুলে যুবককে কি যেন বললেন। মগটা বাইরে এক জনের হাতে বাড়িয়ে দিয়ে যুবকটি সামনের দিকে ঝুঁকলো। দু-মিনিট ঘাড় নেড়ে কানাকানি কথা হোলো। মহিলা একটু সরে বসে খানিকটা জায়গা করে দিলেন। যুবকটি বসলো তার পাশে।

দরজা বন্ধ করা মাত্র তীব্র স্বরে হর্ণ বেজে উঠলো। আরো জোরে—আরো লম্বা হর্ণ। ভীড়কে ভাঁজে ভাঁজে দু-ভাগ করে বেশ গতি নিয়ে ট্যাক্সি অদৃশ্য হয়ে গেলো।

—অদ্ভুত! বলল পার্থ।

—যত সব ঝামেলা—। বলল সঞ্জয়।

—ঝামেলার তো কিছুই দেখলি না। চল্ কোথাও বসা যাক্।

তোকে সব বলব। কলকাতায় নারী স্বাধীনতা—নারী শিক্ষা এনেছিলেন বেথুন সাহেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। স্বাধীনতা এসেছে—শিক্ষা এসেছে কিন্তু একদল হয়ে পড়েছে ভণ্ড। চলার গতি বদ্‌লেছে—মনে হচ্ছে এই কলকাতাটা ঐ দলটার হাতে নূতন রূপ পেতে চলেছে।

—কোথায় বসবি? সঞ্জয় জানতে চাইল।

—চল্, আমার বাড়ী আজ ফাঁকা। বেশ অনেকক্ষণ জমিয়ে গল্প করা যাবে। বিষে— বিষে বিষাক্ত হয়ে পড়েছে সারা কলকাতা।

—তোর আসলে হোলোটা কি? আজ বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছিস্! আড় চোখের ইসারা করে বলল সঞ্জয়।

পার্থর বাড়ীটা পুরোনো। ইংরেজের আমলে তৈরী বাড়ী। মেরামত হয়েছে অনেকবার। ইদানিং পার্থর বাবা একে তাকে খুসী করে রাতারাতি দোতলা বাড়ীকে তিন তলা বানিয়েছেন। মোজায়েক করেছেন সর্বত্র। সোনা স্মাগ্‌ল করার দু-নম্বরি পয়সা। বাড়ী যেন চমকাচ্ছে।

দক্ষিণ খোলা ঘরে নূতন খাট বিছানায় বসলো দুজনে। কোলে একটা তাকিয়া টেনে নিয়ে সঞ্জয় বলল, বল্—তোর প্রবলেমটা কি?

দেখ্ সঞ্জয়, তুই গোয়েন্দা দপ্তরের নামকরা ঝানু অফিসার। আমি আজ বিচার চাই। ওদের এমনিতেই ছেড়ে দেব না। আমায় আষ্টে পিষ্টে বেঁধে ওরা হাণ্টার চালিয়েছে। সুযোগ বুঝে আমার সর্বনাশ করেছে। আমার ভয়ানক বিপদ। প্রতিশোধ নিতে চাই আমি। ঐ অসভ্য মেয়েগুলোকে আমি জব্দ করব।

—সর্বনাশ! মেয়েগুলো মানে! কতজন?

—চার পাঁচজন!

—আসলটি কে? হেরে গেছিস অর্থে—প্রেম ভেঙেছে নাকি!

ফুরফুর করে দক্ষিণের বাতাস বয়ে চলেছিলো। দুজনের বসার ভঙ্গীটি বড় মজার। একজন সামনে ঝুঁকে পড়েছে অন্যজন সোজা। একবারে সামনা-সামনি, মুখো-মুখি। একজনের দৃষ্টিতে ঝিমুনী-ভীতি

মাথা। অন্যজন নির্ভিক। ঠিক যেন বসেছে অর্জুন আর শ্রীকৃষ্ণ। একজন আত্মীয় বন্ধুনাশ, কুলনাশ, জাতি নাশ এবং ধর্মনাশের ভয়ে ধনুক ত্যাগ করে চোখের জল লুকিয়ে রেখে শুক্‌নো মুখে চুপ করে বসে আছে। অন্যজন সখা সেজে তাকে যুগিয়ে চলেছে অনুপ্রেরণা, সু-দৃষ্টান্ত আর পরম জ্ঞান।

—আসলটি কে বললি ?—সঞ্জয় জেরা শুরু করল।

—তার নাম অর্চনা। ওর বন্ধুরা ডাকতো অচেনা বলে।

—বল্, বলে যা। সঞ্জয় সিগারেট ধরালো।

—অর্চনার বাড়ী বালিগঞ্জে। ভাল অবস্থা।

—ওকে চিনলি—মানে পরিচয় কি ভাবে ?

—চিনতে হয়নি—ধরতে হয়নি ! সে নিজেই নিজেকে চিনিয়ে দিয়ে নিজেই ধরা দিলো। শোন্ না—সব বুঝতে পারবি।

—ঠিক হ্যায় ! বলে যা। সঞ্জয় টান মারলো সিগারেটে।

—প্রথম যেদিন গেলাম—ঘরেব টেবিলে চা জলখাবার দিয়ে সে দাঁড়ালো আমার সামনে। পিছনে রাখা তিনটে আয়নায় ওর ছায়া পড়লো। মনে হোলো সারা ঘর জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বহু অপরূপ সুন্দরী। চেহারাব বাঁধন কি। মধুঢালা কণ্ঠে বলল, আমি আপনার কাছে ঋণী। আপনার উপকার জীবনে ভুলব না। - কি ব্যাপারে ঋণী সেটা পরে বলছি।

—ঠিক হ্যায়। এরকম কথা সব মেয়েরাই বলে থাকে।

—তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। যেন স্বর্গরাজ্যের ডানাকাটা পরী। খুব সেজেছিলো সে। রঙে রঙিন চোখ মুখ। শরীরের প্রতিটি ভাঁজে অটুট সৌন্দর্য্য। দেহের তিনটে অংশে যেন স্রোত বইছে। আমি মুগ্ধ হয়ে তাকে দেখতে লাগলাম।

—কি দেখছেন ? সে শুধালো।

—দেখছি তোমাকে। কি নাম তোমার ?

—টেবিলের কোণে কোল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে বলল,—আমি অর্চনা। বন্ধুরা ডাকে অচেনা।—আপনার নাম ? প্রশ্ন শেষ করে সে তার

প্রথম ভাঁজে ভরিয়ে দিলো হালকা, মায়াবী মুচকী হাসি! আমার নাম বলা শেষ করে শুধালাম—কি নামে ডাকবো তোমায়?

—যে নামে ডাকলে বেশী আনন্দ পাবেন। কথা শেষ করে সে তার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাঁজ আমার মাথার সামনে ঝুঁকিয়ে দিলো। উঃ! যেন বাস্তবের বুকে কাল্পনিক তুলি বোলানো ছবি! ঘরে সে আর আমি একা। আমার কোমরে বাঁধা দড়িটা তার হাতে ধরা। মন্ত্রমুগ্ধের মত তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। যন্ত্র চালিত হয়ে সে-ও তাই করলো। হাওয়া বাতাস, ইলেক্ট্রিক আর সারা ঘরের আসবাব পত্র সবই বোবা। বোবার দৃষ্টিতে তার কুমারী রূপ-লাবণ্য ভোগ করলাম অনেকক্ষণ। সে-ও তার ঠোঁটে রকমারী মিষ্টি মুচ্‌কি হাসির খেলা খেললো—তারপব আমার খুব কাছে সরে এসে ধবা দিলো।

—আই সি! লাভ এ্যাট্‌ ফার্ষ্ট সাইট। এতো ইংরাজী ফিল্ম-রে! কিস্‌ করলি? বল্—সত্যি বল্।

—করলাম। এতটা এগুবো বলে ভাবিনি। সবই ঘটনা। এগুলো একের পর এক হঠাৎই ঘটে গেল।

—বেশ্‌ তো! বলে যা। থামবিনা।

—একটু ঝুঁকে বসে পার্থ বলল, ওকে জিজ্ঞাসা করলাম—এত সেজেগুজে কোথায় চলেছো?

—একটু মার্কেটিং এ।—যাবেন আমার সাথে?

—অসুবিধা না হলে যেতে পারি।

—ওমা! একা মানেই তো বোকা। চলুন না আমার সাথে। আই এ্যাম রিয়েলি লাকী। কথা শেষ করে সে আমার হাতটা চেপে ধরে ছোট্ট একটা টান দিয়ে এগিয়ে গেল। পার্থ সিগারেট ধরালো।

—তুই তো বড় লাকী রে!—তবে এত তাড়াতাড়ি এত ঘনিষ্ট হওয়াটা একটু যেন অস্বাভাবিক ঠেক্‌ছে।—কোথায় গেলি তোরা?

—গেলাম ভিক্টোরিয়া—ওখান থেকে নিউমার্কেট। এটা সেটা কেনা কাটা হোলো। বেশ ভালই লাগলো। সে যেন কত চেনা।

চলার মাঝে ঘেঁষাঘেষি, ছোঁয়াছুঁয়ি, চোখাচোখি! কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অচেনা, চেনা হয়ে গেল। তাকে সত্যিই ভালবেসে ফেললাম। সে-ও আমায় ভালোবাসলো। তাকে বাড়ীতে ছেড়ে দিয়ে যখন ফিরছি—সে আমার হাত ছুটো তার বুকে চেপে ধরে বলল—আপনি আমার প্রথম প্রেমিক। কাল আসুন, আমার বন্ধুদের সাথে আলাপ করিয়ে দেবো। পার্থ অনেকক্ষণ কথা বলে সদ্য দিয়ে যাওয়া চায়ের কাপে চুমুক দিলো!

কেক্‌টাতে ছোট্ট কামড় দিয়ে সঞ্জয় বলল, ট্যাক্সি ভাড়া, মার্কেটিং এর খরচ কে করলো?

--অফিয়াস্‌লি—আমিই করলাম। ছিলো মাত্র চারশো টাকা। সব খরচ হয়ে গেলো। আরো থাকলে আরো খরচ হোতো। সে অবশ্য প্রথমে নিতে চায়নি। পরে বলল, আপনার স্মৃতি কখনও মুছে গেলে এই জিনিষগুলো,—শাড়ীখানা আমার প্রথম প্রেমের সাক্ষী বহন করবে। উঃ! সে সব কথা মনে পড়লে—ছি! ছি! ছি!

—ছি? কেনরে? এমন ভোগ, সঙ্গ, ঢল ঢল প্রেম ক'জনের ভাগ্যে জোটে বল্‌? বলে যা—শুনি। বড় ইনটারেষ্টিং ঘটনা।

ওর কথা মত পরের দিন হাজির হলাম বেলা ন'টায়। একগাল হাসি ওর মুখে। গাল ছুটোতে টোল পড়ছিলো। ওর একেবারে অন্যরূপ। ভৈরবী বলব না পূজারিনী বলব। যেন অগ্নিশিখা। চওড়া লাল পেড়ে সাদা শাড়ী—সাদা ব্লাউজ। অতি সাধারণ পোষাক। উঃ! তার সামনে দাঁড়ালাম পতঙ্গের মত। বললো, দেরী হয়ে গেছে। যাচ্ছি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী।—যাবে আমার সাথে?

ওর এলো চুল আর এলো মেলো আঁচলের পিছু পিছু চললাম। ও ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, পূজো দিতে যাচ্ছি। আজ তোমায় একদম খরচ করতে দেবোনা।

রাজী হলাম। ট্যাক্সি ছুটলো। মনে বেশ আনন্দ হোলো। এই প্রথমবার তুমি সম্বোধনে কথা বলে সে যেন আমার সম্মান আরো

বাড়িয়ে দিলো। আড় চোখে, সোজাসুজি তাকে দেখলাম বহুবার!

—কি দেখছো?—দুষ্টু হাসি হেসে সে শুধালো।

—তোমার মাঝে বিশ্বভুবন দর্শন করছি।

—বেশী দেখোনা! নজর লাগবে! —ও মুচকী হাসলো।

—বেশ তো, তার বাঁহাতে আচম্‌কা চিমটি দিলাম। সে তার হাতটা আলতো করে আমার কোলের উপব ফেলে রাখলো। ও হয়তো একমনে মা-কালীর ধ্যানে মগ্না ছিলো—আমি কিন্তু তার দু'টো আংটী আর পাঁচটা কচি আঙুল নিয়ে মনের আনন্দে খেলা করলাম।

—সে আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে বললো, আগে মনে হয় মেয়েদের আঙুল পাওনি কখনও। মুখে তার সেই দুষ্টু হাসি।

—কখন ফিরলি? সঞ্জয় জেরা করলো।

—শুধু মন্দির নয়। ফেরাব পথে ঢুকলাম গ্র্যাণ্ড হোটেলে—পলিনেসিয়ায় খাওয়া—ম্যাটিনীতে সিনেমা—তারপর ট্যাক্সি ছুটলো হেষ্টিং ডিঙিয়ে, বেহালা টপ্‌কে, ডায়মণ্ড হারবার। সকাল ন'টায় বেবিয়ে ফিরলাম রাত সাড়ে এগারোটায়। দ্বিতীয় দিনে সে আমার কাছে আরো সহজ হয়ে গেল!

—ব্রে ভো! এতো সহজ হয়েও সে তোর সামনে আতঙ্ক ছড়ালো কি করে? দুদিনেই সারা কলকাতা চষে ফেললি। এবার বল্‌, এত তাড়াতাড়ি জমে ওঠা প্রেম, ঠিক কত দিন টিকেছিলো? সত্যি করে বল্‌! নিশ্চয়ই এক মাস?—সঞ্জয়ের মুখে বাঁকা হাসি।

—না—না! মাত্র ছাব্বিশদিন। শোন্‌ না! সবটুকু না শুনেই তুই শেষ জানতে চাইছিস্‌ কেন?

—শেষটাতো জানি! তুই হেরে গেচিস্‌, ঠকে গেচিস্‌—বিপদে পড়েচিস্‌! নে—বলে যা—শুনি।

তৃতীয় দিন গেলাম বিকেলে। এক দেবীর চার রূপ। অর্থাৎ অচেনার মত সেজেছিলো আরো তিনজন। তাদের নাম রূপা, শেলী আর মালা। সিনেমার হিরোয়িন-কে ঘিরে সখীদের নৃত্য করতে

দেখেছিস্ তো! ওরা হোলো তেমনি সখী। রূপে ওরা কেউ কম যায়না। রূপার মনমাতানো চোখ, শেলীর উত্তাল পয়োধর আর মালার ঢেউ তোলা নিতম্ব, অচেনার চেয়ে অনেক বেশী আকর্ষণীয়। তবে রূপা বেঁটে, শেলী একটু লক্ষ্মীট্যারা আর মালা কালো।

—তুই যাবার পর ওরা এলো—না আগেই এসেছিলো।

—না—না! ওরা আমার আশা করেই বসেছিলো। আমায় নতুন জামাইবাবু বলে ডাকতে লাগলো। মাঝে মাঝে আমার চোখ টিপে ধরছিলো। আমায় শুধু ঐ হাত ছুঁয়েই বলতে হলো—কে চোখ চেপে ধরেছে। ফাজিলগুলো। অচেনার পারসোন্যালিটি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। সে একটা নাইস্ প্রোপোজ্যাল দিলো। সকলেই মেনে নিলাম। গ্রাণ্ড আইডিয়া। ঠিক হোলো পরের দিন পিক্‌নিক্ যাব।

—ভাল কথা! এবার বল্—দ্বিতীয় দিনে কত খরচ করলি?

—যাবতীয় সব খরচই করলাম। ব্যাপারটা কি জানিস! আনন্দ করতে হলে খরচ করতেই হবে। খরচটা চিরকাল পুরুষরাই করে!—চোখ তুলে, ঘাড় উঁচু করে পার্থ বক্তব্য শেষ করল।

—সাবাস্! তবু বলছিস, ঠকে গেচিস্। বল্, এবার ঐ পিক্‌নিকের গল্প শুনি। একটা সিগারেট দে।

কণ্ঠস্বর একটু নীচু করে পার্থ বলল, পরের দিন যাওয়া সম্ভব হোল না। ব্যবসাদারদের ভাগ্যে মা লক্ষ্মী আনাগোনা করেন সারাবছর কিন্তু প্রেমিকার আনাগোনা কদাচিৎ।

—পিক্‌নিক যাওয়া হোলোনা তাহলে?

—আলবৎ হোলো। আমি অচেনা ম্যাজিসিয়ানের সামনে পুরোপুরি হিপ্‌নোটাইজড্ হয়ে পড়লাম। ওরা ঠিক করলো—পিক্‌নিকের সব খরচ ওরাই করবে—আমি শুধু স্পট্ ঠিক করবো। তা হোলোনা রে! আমি একটি আস্ত ভেঁড়া।—গাধাও বলতে পারিস। স্বেচ্ছায় নিজের ঘাড়টা হাঁড়িকাঠে ঢুকিয়ে দিয়ে ওদের বললাম, নাও কোপ মারো!—ওরা কোপ্ তো মারবেই!

—বুঝলাম ! কোথায় গেলি পিকনিক ?

—আমাদের বাগান বাড়ীতে গেলাম। বন্ধুবান্ধব নিয়ে যাবো বলে বাবার পারমিশান নিলাম। রবিবার দোকান বন্ধ থাকে। দাদার কাছে গাড়িটা চেয়ে নিলাম। ওদেব চারজনকে নিয়ে হিন্দী সিনেমাব নায়কের মত অচেনাকে পাশে বসিয়ে গাডী চালালাম। নির্জন বাগান বাড়ী। মালি, বেয়ারাদেব ভাল বকশিস্ দিলাম। ওরা ইসারা বুঝলো। আমাদের খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয সবকিছুর সু-বন্দোবস্ত করে অনেক দূরে রইলো। শুরু হোলো হৈ, হল্লা। ছুটোছুটি, নাচানাচি, হুড়োহুড়ি, জড়াজড়ি। ওরা চারজনেব দল। আমি একা সে এক অপূর্ব পরিবেশ ! দুপুরের আহার শেষ হ'তেই শুরু হোলো টাকা লুকোনোর খেলা ! চমক মাখানো দৃষ্টিতে পার্থ চেয়ে রইলো।

—সে আবাব কোন ধবনের খেলাবে।

—সঞ্জয়েব মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পার্থ বলল, আমি আ:গ জানতাম না—ওরা আমায় শেখালো। এটা হচ্ছে লুকোনো আব সার্চ করার খেলা ! আমাব পকেট থেকে গুণে টাকা নিয়ে ওরা প্রত্যেকে ওদের শরীরের বিভিন্ন গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখলো। ওদের একে একে সার্চ করে সব টাকা বার করতে হোলো আমায়। আমিও লুকোলাম। সার্চ করলো ওরা। সে কি এক্সাইটিং খেলাবে সঞ্জয় ! তিন জনকে বাইরে রেখে একজনকে ঘরে নিয়ে গিয়ে তন্ন তন্ন করে সার্চ করার খেলা খেললাম আমরা। উঃ ! অচেনার সে কি লজ্জা। একে মেয়েছেলে—তার উপর সে স্বভাবতই একটু বেশী লাজুক। নারীর ভূষণ হোলো লজ্জা। সেদিন যখন ওকে সার্চ করছিলাম তখনই সে আমায় বলেছিলো, এর পরের পিকনিকে সে আরো অনেক নূতন খেলা শেখাবে। সেদিনই আমি আড়াই হাজার টাকা খরচ করলাম। কথা শেষ করে পার্থ নিজের পৌরুষ জাহির করে সিগারেট ধরালো।

—খরচ করলি মানে ? দ্রুত প্রশ্ন করলো সঞ্জয়।

—মানে শেষবার আমায় ফাঁকা করে সব টাকাগুলো ওরা নিলো বটে কিন্তু বহুভাবে খুঁজে একটি টাকাও পেলাম না।

—তার মানে, ওরা ওদের ব্যাগে লুকিয়েছে—ওরে ক্যাব্‌লা সেটুকু বুদ্ধিও ছিলোনা তোর।

—আমি তা জানতাম। শেলীকে তো একেবারে মানে মুক্ত করে —মানে—

—বুঝেছি! মানে তাকে বিবস্ত্রা করে খুঁজেছিলি?

—ঠিক তা নয়। তার কাছে টাকা ছিলনা প্রমাণ করতে সে নিজেই তাই করলো। তবে একটা কথা কি জানিস্। টাকা বিলিয়ে দেবার মাঝেও একটা আনন্দ আছে রে। কিছুই সংগে যাবেনা! পার্থ এটা সেটা আরো কি বলতে বলতে বুঝদার ও চালাকের ভঙ্গীতে হেঁ- হেঁ—হেঁ-করে হাসলো।

—এতটাকা দিলি, ওরা কি দিলো তোকে?

—বললাম তো, যা চেয়েছি তাই পেয়েছি। আরো চাইলে আরো পেতাম। ওরে আমায় তুই বিবেকানন্দ বা রামকৃষ্ণ ভাবিস্‌নি। পার্থ আগের মত হাসলো আবার।

—টয়লেট থেকে ঘুরে এসে সঞ্জয় বলল, বহু ঘটনা শুনলাম। তুই হেরে গেচিস্, ঠকে গেচিস্ বলে প্রলাপ বকছিলি কেন? তুই তো চার হিরোহিনের হিরো-রে! তুই তো একজন মোষ্ট ব্লেসেড্ ম্যান্ রে! —তোকে দেখলে হিংসে হয়।

—ভোগ করতে গেলে টাকা চাই। নো মনি—নো এন্‌জয়মেণ্ট। নিজের বাসনা, কামনা আর আত্মতৃপ্তির জোয়ারে ভেসে দশদিনের মাথায় ওদের প্রত্যেককে একটা দুটা করে গহনা কিনে দিলাম। আমার দেওয়া জড়োয়ার সেট্‌টা নিতে অচেনার সে কি লজ্জা! সলাজ হাসি হেসে সে আমাব আঙুলে একটা আংটি পরিয়ে দিলো। আংটিব বদলে পরের দিন আমি ওকে দিলাম ডি. কে. চন্দ্র জুয়েলারের নূতন ডিজাইনের একটা। নেকলেস্। দামী জিনিষ ওটা। একেবারে আসল—খাঁটি সোনা। সেটা গলায় ঝুলিয়ে সে আমায় বহুভাবে

চুমো খেলো, প্রণাম করে পায়ের ধূলো মাথায় বুলিয়ে—গলা জড়িয়ে ধরে বললো, হাউ নাইস্ ইউ আর! সত্যি কথা বলতে কি, অচেনার চলা, বলা, ভাবভঙ্গী আর আদব কায়দা যেন একটা এ্যারিস্ট্রোক্রেসীতে ভরপুর। সে হচ্ছে জিনিয়াস—বিউটিফুল!

—সব মিলিয়ে বিশ ত্রিশ হাজার খস্‌লো তাহলে? সঞ্জয় তার আন্দাজটা যাচাই করে নিতে চাইল।

পার্থ হেসে বলল,—

পুত্র-মিত্র-অর্থ-ভার্য্যা সংগে সাথী নয়—
মরিলে সম্বন্ধ নাহি কারো সাথে রয়।

—বা! বা! কিন্তু একটা কথা। তোর এই সু-শৃঙ্খল পরোপকাব লিপ্সা যখন এতই জাগ্রত, তোর স্বপ্নময় প্রথম প্রেম-বসন্ত যখন তোকে বাস্তবে এমন মধু ঢালা খুসী, আনন্দ, সুখ ও উত্তেজনা জোগালো তখন তুই প্রতিশোধ নিতে চাস্ কোন দুঃখে?

—সেই কথাই বলব এবার। মার খেলাম তো এই খানেই। ব্যাঙ্কের সব জমা শেষ হলো। রীতিমত চিন্তায় পড়ে গেলাম। এমন কষ্টলি প্রেম ধরে রাখতে শুধু যে টাকার প্রয়োজন তা বুঝেছিলাম। হিন্দুস্থান ইন্‌টারন্যাশানাল, পার্ক হোটেল, গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল থেকে শুরু করে কোনো হোটেল বাদ দিইনি রে! জানতাম যতক্ষণ সাধ্যে কুলোবে ততক্ষণ চালিয়ে যাব। কিন্তু হঠাৎ এলো সর্বনাশ।

—চুপ হয়ে গেলি কেন?—বল্, শেষটা শুনি।

—বলছি। পার্থ একটু ভেবে নিয়ে আবার শুরু করলো। বলল, গত বুধবার অর্থাৎ তিনদিন আগে ম্যাটিনি শোতে সিনেমা দেখে অচেনাকে বাড়ী পৌঁছে দিলাম। ফিরবার সময় শুনলাম, তার মা নাকি অসুস্থা। তার পিছু পিছু মায়ের ঘরে সেই প্রথমবার ঢুকলাম। শুনেছিলাম তার অসুখ। কিন্তু গিয়ে দেখলাম তিনি অঝোর নয়নে কাঁদছেন! মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। এই ধরনের কান্না দেখে বুঝলাম, অসুখটা শরীরের নয়—মনের। কারন জানতে চাইলাম।

তিনি দু-চারবার ফুঁপিয়ে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন। আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

—কেঁদোনা মা, সকলের চিরদিন একভাবে কাটে না। সান্ত্বনা দিলো অচেনা। মায়ের চোখ মুছিয়ে দিয়ে ঐ খাটের এক কোণে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইলো। অচেনার দেখ াদেখি আমিও শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে জড় পদার্থের মত বসে রইলাম।

—কোনো প্রিয়জন মাবা গেছে নিশ্চয়ই' —সঞ্জয় শোক প্রকাশ করলো।

—নো—ও—ও। কেউ মারা যায়নি। তিনি বালিশের তলা থেকে টেনে বার করলেন খামে মোড়া একখানা চিঠি। আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ঠাকুরের নামে দিব্যি করে বলছি—তুমি আজ আমার পেটের ছেলের চেয়েও আপন। অর্চনার কাছে তোমার কত গল্প শুনি। তুমি হৃদয়বান, দয়ালু, আমুদে এবং বুঝদার। এ বয়সে এর চেয়ে বেশী আর কে হতে পারে? এ চিঠি তোমায় পড়াতে এতটুকু সঙ্কোচ নেই আমার। আজ আমার বড় দুর্দিন। আর কত সহ্য করতে পারবো। আব কত জ্বালায় জ্বলবো। মাথার উপর ঐ বোঝা। মেয়েটার বিয়ে দিতে পাবলাম না।—বয়স হয়নি ওর: এই ফাল্গুনে ছাব্বিশে পড়বে। তোমায় আর কি বলব? তবু কারো কাছে বলে মনটা হালকা নয়। অচেনা খাট থেকে উঠে গেল। উনি শাড়ী গুছিয়ে একটু নড়ে বসলেন।

—নিশ্চয়ই অচেনাকে বিয়ে করতে বলল?

—না, তা' নয়। বললেন, চিঠিটা আগে পড়ো, সব বলছি।

—পড়লি চিঠি?

—শোন বলি। আগেই বলেছি আমি ফতুর। ব্যাঙ্ক ফাঁকা। মায়ের কাছে দু-তিন হাজার নিয়েছি। কাউকে বলতে বারণ কবে বৌদির পাশবুক থেকে নিয়েছি চার হাজার। বোনের কাছে, বন্ধুদের কাছে এমনকি দোকানের তিনজন কর্মচারীকে সুদ দেবো বলে নিয়েছি টাকা। দাদা তখন সন্দেহ করতে শুরু করেছে। পাগল হবার উপক্রম!

দাদার সন্দেহ যাচাই করে নিতে বৌদি দুবার কৈফিয়ৎ চেয়েছে। উপদেশ দিয়ে বলে গেছে—খরচ করলে কেউ ফতুর হয়না—জলে ফেলে দিলে মানুষ ফতুর হয় ঠাকুর পো! সাবধান!

—চিঠিটা পড়লি না কেন? সঞ্জয় ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করলো।

—আরে বাবা, পড়ার সুযোগ পেলেতো! তিনি বলে চললেন, বলতে পারো বাবা, একজন মানুষ একার বুদ্ধিতে কি করে সবদিক সামলাতে পারে। আমি তো রক্তমাংসেব তৈরী মানুষ—না কি! সহ্যের সীমা পেরিয়েছে। এই পৃথিবীর ভোগ বিলাস, সৌন্দর্য্য এমনকি এতটুকু স্বাধীনতার মুখ দেখিনি। ঐ মুখপুড়ি মেয়েটাকে মানুষ করতে কি না করেছি। মা হয়ে দিয়েছি স্নেহ, ভালবাসা আর নিখুঁত কর্তব্য। স্ত্রীরূপে স্বামীকে দিয়েছি ভরসা, উৎসাহ আর নিঃস্ব হয়ে করেছি অসীম ত্যাগ। নিজেকে উজাড় করে দিয়েছি বাবা। আর পারছিনা।—তুমি পারো, একগাছা দড়ি এনে আমাব গলায় বেশ শক্ত করে বেঁধে দিতে। কথা শেষ করে তিনি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে শাড়ীর আধখানা আঁচল গুটিয়ে সারা মুখে চাপা দিলেন। আঁচল চাপা অবস্থায় অস্পষ্ট স্বরে কান্না ভেজা, সুরে বললেন, ঈশ্বর চান্ না আমি এই সুন্দর জগতের মাঝে জননীর সাজে আশ্রমবাসিনী সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবো। আমি যে বিষ খেয়ে মরবো—তা-ও পারছিনা—ঐ পোড়াকপালি মেয়েটার জন্যে। ও মরেও মরেনা—আমার পথের কাঁটা হয়ে বসে আছে! সব শত্রু—সব গরল। কথা শেষ করে তিনি ফঁকিয়ে কেঁদে উঠলেন।

অবাক স্বরে সঞ্জয় বলল—চিঠিটা পড়লিনা কেন?

—চিঠি পড়লাম। ওনার স্বামীর চিঠি। বিদেশে ব্যবসা করেন। ওনার স্বামীর দু-চারদিনের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে দুজন কর্মচারী বেশ কিছু টাকা আত্মস্যাৎ করেছে। পত্র পাঠ দশ-পনেরো হাজার টাকা না পাঠালে হয় তিনি কারাবাস ভোগ করবেন না হয় নরকরূপী কারাবাস এড়াতে বিষ খেয়ে মরবেন।

—চমৎকার। এতো দেখছি মা আর মেয়ে এক ছাঁচেতে গড়া। কি করলি তুই? সঞ্জয় সোজা হয়ে বসলো।

—চিঠি পড়ে তার দিকে চাইলাম। তিনি বিছানা থেকে উঠে এসে আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন, এক অলুক্ষুণে আতঙ্কে আমার সারা শরীর কাঁপছে। এই অশুভ মুহূর্তে—এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার গ্রাস থেকে মুক্তি পাবার কোনো পথ বাত্‌লে দিতে পারবে বাবা?—অন্ধের যষ্টি তুমি। অর্চনার বাবার নামে শপথ করে বলছি এই সামান্য ক'দিনে তুমি আমাদের অতি আপন করে নিয়েছো। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুণ,—তুমি রাজা হও।

অচেনা ঘরে এলো চা জলখাবার নিয়ে। বললো, মা, তুমি দাঁড়িয়ে আছো কেন? এক্ষুণি আবার মাথা ঘুরে পড়ে যাবে।

–বাহবা! মেয়েটি সত্যিই বুদ্ধিমতী।—তারপর?

মাংসের কাট্‌লেটে কামড় দিয়ে ভাবছিলাম কি করা যায়! হঠাৎ উনি বললেন, বিপদের বন্ধুই আসল বন্ধু। যেমন করেই হোক আমায় উদ্ধার করতেই হবে। এই বাড়ীটা বন্ধক দিয়ে যেখান থেকে পারো এ টাকাটা জোগাড় করে দাও বাবা!

—বলে যা. থামিস্ নি। সঞ্জয় বড় গম্ভীর হয়ে পড়ল।

—তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম অচেনার খুব চেনা এক উকিলের বাড়ী। অচেনা সাথেই ছিলো। বাড়ীটা বন্ধক দেবার প্রস্তাব করলাম উকিলবাবুর কাছে। তিনি বললেন, জানেন না তাই বুঝিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে হঠাৎ বাড়ী বন্ধক রাখা যায় না, খুসী মত টাকাও মেলেনা। সাথে অর্চনা আছে তাই আপনাকে আমি তিনমাসের জন্যে পনেরো হাজার টাকা ধার দিতে পারি।

—টাকা নিলি তুই? ধার করলি তো?—সঞ্জয়ের কণ্ঠস্বরে আরো আতঙ্কের ছাপ।

—করলাম! পনেরো হাজার টাকা নিলাম। সই করলাম তেইশ হাজারে।

—ক্যাবলার ডিম্‌ তুই। তারপর? উঃ!

উকিলবাবু বলে দিলেন, তিনমাস পার হতে দেবেন না। তাহলে আমায় কেস করতে হবে। অর্চনা ও তার মা আমার হয়েই সাক্ষী দেবে। কেস করলে আপনার আরো ক্ষতি।

—সব শেষ! সঞ্জয় বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালো। একটু পায়চারি করে বলল,—কাকে দিলি টাকাটা?

—ওর মাকেই দিলাম। উনি সস্নেহে আমাকে তার বুকে চেপে ধরলেন। বললেন, আমার বাড়ীতে তুমি মহাপুরুষ এসেছো। জগৎ আজ মিথ্যা হতে পারে কিন্তু ঈশ্বর প্রেরিত তুমি আমাদেব সামনে চিবসত্য আর পরম হিতাকাঙ্খী।

রাত তখন এগারোটা। বাড়ী ফিরব বলে ওদের সদর দরজার কাছে এসে দেখলাম সেখানে দাঁড়িয়ে আছে অচেনা।

—নিশ্চয়ই ধন্যবাদ জানালো? সঞ্জয় প্রশ্ন করলো।

সে আমার পথ আগলে দাঁড়ালো। ঘাড় তুলে আমার চোখে চোখ রেখে বলল, আমায় খুব ভালবেসেছো বলে আজ শাস্তি পেলে। এ টাকা নিতে আমার মন সায় দেয়নি। মনে রেখো, আজ তুমি মহৎ, হৃদয়বান আর সত্যিকাবের নির্ভিক বীর। তুমি অসাধারণ, তুমি দৃষ্টান্ত, তুমি তোমার কর্মের মধ্যেই প্রমাণ করেছ যে তুমি গুণাতীত। মায়ের আজকের ঋণ কিছুটা যদি শোধ করতে পারি। প্লীজ, এত রাতে তোমায় কিছুতেই যেতে দেবোনা। যদি যেতেই হয় তাহলে আমাকে মেরে রেখে যাও!

—সে আবার কি? সঞ্জয় খাটে বসল পা ঝুলিয়ে।

পার্থ নিজেকে একটু সংযত করে বললো,—অচেনা আমায় রীতিমত বাধা দিলো। বললো, আজ রাতে তুমি আমায় কাছে নাও। শয়নে, স্বপনে, জাগবণে আমি শুধু তোমারই। এসো, আজ আমার কাছে এসো। আমরা আজ একথালায় দু-জনে এক সাথে খাবো—এই রাতটুকুর জন্যে আমার কাছে থাকো। এ—সো—ও—ও!—

—তুই রয়ে গেলি? দ্রুত প্রশ্ন করতে গিয়ে সঞ্জয়ের কথা যেন একটু জড়িয়ে গেল।

—হাঁ—রয়ে গেলাম। ভোরের আঁধারে শেষবার ওর চুমো খেয়ে কথা দিলাম ওকে বিবাহ করব!

—ছ্যা! ছ্যা। বাইজী পাড়ায় এর চেয়ে অনেক কম খরচে আরো অনেক ফূর্তি করতে পারতিস্ রে! এদের বিষাক্ত রক্তে মিশে আছে প্রবঞ্চনা আর অধর্ম। এদের না আছে কলঙ্কের ভয়—আর না আছে নরকের ডর। এরা হিংস্র, খানদানী এ্যারিষ্টোক্রেট্ কুলটা,—যারা চিরকাল বিজয়িনীর উত্তেজনায় গর্বিতা। সত্যি কথা বলতে কি, এরা না কুমারী—না সধবা বা বিধবা। এদের চাকচিক্য বেশবাসে। —এরা মহাপাতকী। মরুভূমির মরিচীকা! যাক্, তুই অনেক দিয়ে অনেক পেয়েছিস্।—ঠকে গেলি কি করে? সঞ্জয় ধীরে প্রশ্ন করলো।

—দেবা ন জানন্তি—কুতো মনুষ্যঃ! পরের দিন সন্ধ্যায় গেলাম। অচেনার দেখা পেলাম না। দেখা পেলাম ওর শেলী বন্ধুর। শেলা আমায় ইসারায় ঘরের এক নির্জন কোণে ডেকে নিয়ে গেল। স্পষ্ট বলল—অচেনার মা বিধবা—স্বামীর চিঠিটা একটা ভাঁওতা: অচেনা ওনার মেয়ে নয়—এ বাড়ীটাও ভাড়াবাড়ী!

—বলিস কি রে? সঞ্জয় লাফিয়ে উঠলো।

খাট থেকে নেমে পার্থ দাঁড়ালো সঞ্জয়ের মুখোমুখি: বললো, শেলী আমায় বলেছে, ওদের এত সাজ, এত ঠাট্ সবই এইভাবে পরের মাথায় হাত বোলানো পয়সায়। খুব বাড়াবাড়ি হয়েছে। —এখানে আর আসবেন না। এরা আপনাকে পথের ভিখারী করে ছাড়বে। মান যাবে—কুল যাবে—এরা আপনাকে নিংড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে ডাষ্টবিনে! বল্—বল্ সঞ্জয় আমি এখন কি করি?

—এ তো একটা গোটা উপন্যাস রে! একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো তোকে—এদের সাথে প্রথম পরিচয় হোলো কিভাবে? সঞ্জয় ব্যস্ত হোলো প্রশ্নের উত্তর পেতে।

—শোন্ সে ঘটনা। আজ থেকে ঠিক চার সপ্তাহ আগের কথা। সেদিনও ছিল শনিবার। ফুটপাথ ধরে একাই হাঁটছিলাম। ক্যাচ্ করে একটা ট্যাক্সি ব্রেক্ কষে দাঁড়ালো একেবারে আমার পাশেই

রাস্তার ধারে। ড্রাইভার লাফিয়ে নেমে জল জল করে চীৎকার করলো। দেখলাম, ট্যাক্সিতে এক মহিলা ঘাড় কাৎ করে অজ্ঞান হয়ে শুয়ে আছেন।

সঞ্জয় হাত নেড়ে বললো, সেদিন আর আজকের ঘটনায় হুবহু মিল দেখছি।

—শুধু মিল নয়···! রিপিটেশন্।

—রিপিটেশন্!—ঠিক বল্‌ছিস্?

—একেবারে সত্যি বলছি। সেই ট্যাক্সি, সেই ড্রাইভার আর মাথায় সিঁদুর মাখা ঘাড় কাত্ করা সেই ছলনাময়ী, এলোকেশী শয়তানী অর্চনার ভাড়া করা মা। আমায় চুষে ছিব্‌ড়ে করেছে গত বুধবার। আজ তাই খাঁচায় পুরলো নোতুন শিকার। আমার মনের মাঝে যে জ্বালা, আমার অর্ধদগ্ধ ঘেয়ো হৃদয়টার মাঝে যে দংশন অহবহ আমায় অস্থির করে তুলছে—তা' তুই বুঝবি না সঞ্জয়! এটা একটা সু-সংবদ্ধ দলের নিখুঁতভাবে তৈরী ষড়যন্ত্র! আজ শনিবার। আমাব গলায় মরণ ফাঁস পরিয়েছিলো এই শনিবারেই। আমি আজ রিক্ত, নিঃস্ব আর অসহায়। ট্যাক্সির কাছে যেতে বাধা দিয়ে তোকে বাঁচিয়েছি সত্যি, কিন্তু যে যুবক মগে করে জল নিয়ে গিয়ে ওদের পাতা জালে জড়িয়ে পড়ল, তাকে বাঁচাতেই হবে ভাই!

—সেই কথাই তো ভাবছি। সঞ্জয় বলল বজ্রগম্ভীর স্বরে।

—ভাবতে গেলে—অনেক দেরী হয়ে যাবে। এতক্ষণে অর্চনা ঠিক রঙিন সাজে টেবিলের কোণে কোল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসিতে মুখ ভরিয়ে···উঃ! যুবকটি হয়তো বোকা হাবার মত বোবা সেজে ক্রমশঃ অবশ হয়ে যাচ্ছে। তুই গোয়েন্দা দপ্তরের অফিসার! এই কদর্য্য, কৃতঘ্ন জোচ্চরের দলটার বিরুদ্ধে তুই কি কিছুই করতে পারবি না? প্লীজ—

—পারবো! পারতেই হবে—। সঞ্জয় চীৎকার করে উঠলো।

—দেরী না করে তুই এক্ষুণি ব্যবস্থা কর ভাই। ঐ যুবক আমার মাসতুতো ভাই। ওরে ওরা বেজায় ধনী—তিন খানা

সোনার দোকান ওদের—দশ-বারো খানা বাড়ীর মালিক ওরা। তুই ওকে বাঁচা ভাই!

—দে, তাড়াতাড়ি ঠিকানাটা লিখে দে। ঐ ভদ্রবেশী ডাইনী দলের আসল রূপ না দেখে ফিরব না। ওদের প্রত্যেকটাকে জেল খাটাবো, চাবুক মারবো,—শেষ করে তবে ফিরবো।

ঠিকানাটা নিয়ে কোনোভাবে জুতোটা পরে সঞ্জয় ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলো।

মহিলারা ঠাট্টা করে বলতো, বিশু আমাদের বিপদভঞ্জন হরি। ও সাথে থাকলে ভয় কি ?

এর কারণটা সকলেরই জানা। কোনো মহিলা দু-তিনটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ী যাবে,—বিশু যাবে সঙ্গে। গ্রামের, ভিন্ গ্রামের একদল মহিলা বর্ধমান শহরের রূপমহল সিনেমা হলে যাবে, ঐখানে দেশবন্ধু, নেতাজী, কিংবা গৌরী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে বসে মিহিদানা, দই বা সন্দেশ খাবে—সেসব ব্যবস্থাও করবে বিশু।

এছাড়া বাচ্চাদের নিয়ে কাছাকাছি হেল্‌থ্‌ সেণ্টারে বা হাসপাতালে যাওয়া, শিশুদের স্কুলে, পাঠশালায় ভর্তি করানো, জেলে ডেকে কারো পুকুরে বা ডোবায় মাছ ধরানো,—সব ব্যাপারেই চাই বিশুকে। আশেপাশের দশ-বিশ খানা গ্রামের বহু কুমারীর ও তাদের বংশের পরিচয় লেখা আছে তার নোটবুকে! ঘটকালি করা ওর একটা বড় কাজ। দিনরাত খাটে।

বিরামবিহীন পরিশ্রম।

কাছাকাছি একটা গ্রামে থাকত বিশুর এক শত্রু। সে হোলো নিবারণ মুখুজ্যে, নিবারণের সাথে বিশুর দেখা হলেই শুরু হত সাপে-নেউলে যুদ্ধ। প্রথমেই বিরাট ফণা তুলে হেলে দুলে নিবারণ প্রশ্ন করত,—কিগো গিন্নীমা, কি রান্না হ'লো ?

নিবারণ একজন ব্যবসাদার। পাক্কা সোস্যাল ওয়ার্কার। পুরুষদের খুশী করার ব্যবসা তার। উঠ্‌তি বয়সের কলেজের ছাত্র, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ এবং পাঁচটা গ্রামের হাঁড়ি, দুলে, কুলী, বাগ্‌দী—সকলেই আসতো তার কাছে। গ্রামে কোন নতুন অতিথি এলেও তার সাথে একটু আলাপ জমিয়ে যেত।

নিবারণ মদ বিক্রি করতো। যে রোগের যে ওষুধ। সে

ষ্টক রাখতো সব রকমের নেশার বস্তু। মদ, ধেনো, গাঁজা, আফিং, চরস, এমনকি আজকালকার নেশাবাজদের জন্য হেরোইন, ড্রাগ ইত্যাদিও রাখতো লুকিয়ে।

বিশু যেতো সব অন্দর মহলে নানা ফাই-ফরমাশ খাট্‌তে। বার-মহলের সব আসতো নিবারণের নেশার আখড়ায়। বহু সংসারের বহু জননীর আবেগ ও উত্তেজনার অবসান ঘটিয়ে প্রথমজন আনন্দ পেতো, কিন্তু দ্বিতীয়জন মানুষের স্ফূর্তির লোপ্‌ সাধন করে যুগিয়ে দিতো কাঁপুনি, হাঁপানি, ঝিমুনি। একজন স্বপ্ন দেখেছিলো উন্নত সমাজ তৈরী করে তাতে জুড়ে দেবে আশা, ভরসা, উৎসাহ, কিন্তু অন্যজন শপথ নিয়েছিলো তার নিকৃষ্টতম ও জঘন্য ব্যবসার মাধ্যমে বিস্তাব করবে নিন্দনীয় ও দণ্ডনীয় অপরাধেব শাখা-প্রশাখা।

নিবারণের ফণার আঘাত সামলাতে বিশু খানিকক্ষণ লাফ্‌ঝাঁপ করে গিন্নীমা ডাকেব বিদ্রুপ ভাঙ্গকে পরাস্ত করতো। বলতো শা-লা আহাম্মক, শয়তানের বাচ্ছা, শালার ব্যাটা হারমজাদা, এই গ্রাম কি বর্ধমানেব রাজবাড়ী? সহজ সরল নিরীহ মানুষগুলোকে তুই জাহান্নামে পাঠাচ্ছিস? এজন্মের কর্মফল শা-লা শতজন্ম ভোগ করবি, ল্যাংড়া হবি—নরকের কীট হবি।

খুব খানিকটা হেসে নিবারণ শেষ ছোবলটা মেরে বলতো ছাখ্‌না এবার এই অন্দর মহলে এই হেরোইন পাঠাবো। সব গিন্নী আর কুমারীরা চোখ ঘোলাটে করে তোর ঐ কৃষ্ণমূর্তি দেখবে। তোকেও মজা দেখাচ্ছি। এই হেরোইন খাইয়ে তোকে বাসের মাথায় চড়িয়ে দেবো। তোর কেষ্ট ঠাকুরকেও নেশা করিয়ে শিব সাজাবো।

বিষধর সাপের ফণার দংশন খেয়ে নেউল গভীর জঙ্গলের দিকে ছুটে যায় প্রাণদায়ী কোন ওষুধের খোঁজে। বিশুও কোন কথা না বলে রণে ভঙ্গ দিয়ে হনহনিয়ে ঢুকে পড়তো যে কোন খোলা খিড়কী বা সদর দরজা দিয়ে। সে সবকিছু মানিয়ে নিতে পারে, কিন্তু তার শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে কেউ ঠাট্টা করুক এটা সে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারতো না।

তার হাবভাব দেখে অন্দর মহলের মহিলারা হেসে লুটোপুটি খেতো! সহানুভূতি মাখা কণ্ঠে বলতো, তুমি রেগে যাও বলেই তো ওরা তোমার পিছনে লাগে—তুমি না সাধক! তুমি না ভক্ত! তোমার রাগ সাজেনা বিশু। হাতী রাস্তা দিয়ে যায়, পিছনে কত কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, কিন্তু হাতীকে কখনোও চটে যেতে দেখেছো?

আসলে ওদের এই লড়াইটা ছিল লোক দেখানো। এই কোঁদলেব গুরুত্ব ছিল হাল্কা। মা ছেলেকে মুখোশ পরে ভয় দেখায়। মুখোসের ভেতব স্নেহময়ী জননীর চোখ দুটো থাকে সজাগ। নিবারণের মনেও থাকতো বিশুর ওপর এক শুদ্ধ ভক্তি আর অপার স্নেহ। সে ভাবতো, বিশু হচ্ছে অনাথের নাথ, অন্ধের যষ্টি আর জনগণের পরম সখা। বিশুর মুখের সামান্য অভিশাপ বর্ষণ—তার পাপ যেন ধুয়ে দিতো।

সেদিন সন্ধ্যার পর সব খদ্দেরদের বিদায় দিয়ে নিবারণ দোকান বন্ধ করছিলো। ঠিক সেই সময় বিশু এসে হাজির।

বিশুকে দেখে নিবারণ অবাক। সাদরে দু-হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে সে চীৎকার কবে বললো কি ভাগ্য আমার। ধার্মিক এসেছে পাপীর কর্ম শালায়। বামকৃষ্ণ এসেছেন—পতিতার গৃহে।—বলো কি করতে পারি আমি?

—একটা বিপদে পড়েছি নিবারণ দাদা। তুমিই পারো বাঁচাতে। কাতর কণ্ঠে বললো বিশু।

—কে কাকে বাঁচায়! তোমার এই আগমন আমার মুক্তিব ইশারা। বিপদ তো আমার নিজের। এই পাপ ব্যবসা আমার আর ভালো লাগেনা ভাই। তুমি বরং আমায় পথ বাতলে দাও! কি করি—কোথায় যাই?

--শ্রীহরিকে ডাকো দাদা। তিনিই তো সব।—তুমি আমায় একটি পাত্রের সন্ধান দিতে পারো?

—পাত্রের সন্ধান আমি দেবো?—মুচিকে বলছো চণ্ডী পাঠ করতে?

—পাত্রের কি বুঝি আমি? —মৃদু হেসে বললো নিবারণ।

—হেসো না, তুমিই পারবে। গত একমাস সারা বর্ধমান চষে ফেলেছি। কিছুতেই কিছু হলোনা। ঠাকুর আমায় তোমার কাছেই পাঠালেন।

—কষ্ট করে যখন আমার দ্বারে এসেছো, তোমায় আমি এড়াবো না। বলো, কার মেয়ে, কেমন মেয়ে, কোথায় বাড়ী, নাম কি ?

—শেফালী গো। ওই যে, নতুন হেডমাষ্টার মশাই-এর মেয়ে। একে তো মা-হারা মেয়ে তার ওপর খুব রোগা।

—শুধু রোগা নয়, বলো রুগ্না। ওর তো টি. বি. হয়েছিলো। তাছাড়া শুনেছি ওর বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে !

—চল্লিশ মোটেই নয়, বত্রিশ। শিক্ষিতা মেয়ে গো। অবশ্য অসুখটা এখন ভালো হয়ে গেছে। একটি ভালো ছেলে পেয়েছিলাম। বয়সে মিললো, স্বাস্থ্য সুন্দর, উপায় করে মোটা টাকা।

—সেই তো ভালো ছিল। কি হল সেটার ?

—সবই তাদের পছন্দ ছিল। শেফালীর গায়ের রংটা তো খুব ফরসা।—কি হল জানো ? বললাম মেয়ে রোগা। তাতেও তারা রাজী। শেষকালে ওর রোগের সত্যি খবরটা জানিয়ে দিলাম।

—কেঁচে গেলো তো ? সে তো যাবেই। যাক্, আজকে একটু ভাবতে দাও। কাল একটি পাত্রের খবর দেবো। মনে হয় সে রাজী হবে। কাল আমি যাব মাষ্টার মশাই-এর বাড়ী। ঠিক সকাল আটটায়। তুমিও এসো। পাত্রকে সাথে নিয়েই যাবো। হাতে পাঁজি মঙ্গলবারের কি দরকার।

—বাঃ! এই না হলে আমার দাদা। এই বিয়েটা দিতে পারলেই আমার শতকুমারীর বিয়ে দেওয়া হবে। সত্যিই দাদা তোমার এ ঋণ কি দিয়ে শোধ করব জানি না।

বিদায় নিয়ে খুব খুশী মনে বাড়ী ফিরলো বিশু। গত একমাস সে ভালো করে ঘুমোয় নি। আজ সে নিশ্চিন্ত। শেফালীর জন্য পাত্র পাওয়া যাবে তাহলে ? আজ প্রাণ ভরে ঘুমোবে সে। কিন্তু একটা চিন্তা হঠাৎ তাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেললো হাজারো প্রশ্ন তুলে।

শেফালীর হয়তো বিয়ে হবে নিবারণের পছন্দ করা পাত্রের সাথে।—মদ্যপায়ী পাত্র হবে না তো! মায়ের নিশ্চিন্ত কোলে শিশুদের যে বিশ্বাস,—নিবারণের আশ্বাসে সেই নিশ্চয়তা কোথায়? ধৈর্য, সহ্য আর উদ্বেলিত আশাকে চেপে রেখে শেফালী বিয়ের পর সিঁথি ভরে সিঁদুর মাখার সুযোগ পাবে সত্য, কিন্তু ঐসব পাওয়া, মুহূর্তের মধ্যে সব হারানোর মাঝে বিলীন হবে না তো? গরম কড়ায় ফুটন্ত তেলের মাঝে জ্বালাময় ছটফটানি এড়াতে কৈ-মাছ লাফ দিয়ে যদি জ্বলন্ত উনানে পড়ে! ছিঃ ছিঃ! মাতাল স্বামীর মাতলামি. পাগলামি আর অত্যাচার শেফালী কি করে সহ্য করবে? এতে কি তার মত ঘটকের সম্মান বাড়বে! বর্ধমান জুড়ে তার সুনাম। সাধারণ পাতি-ঘটকরা অবশ্য এমন বদনাম পায় বারবার,—প্রতিবার। কিন্তু বিশু তো নাম করা ঘটক।

নিদারুণ অনুশোচনা গ্রাস করলো বিশুর অনুভূতিকে অত্যাচারী দুর্ধর্ষ ঐ নিবারণ দানবকে সে অজান্তে পরিয়েছে দেবতার পোষাক। পাঁক ঘেঁটে, বিষ বিলি করে যে অসৎ ব্যক্তি সৎও সত্যকে অস্বীকার করে বেড়াচ্ছে—সেই পাষণ্ড নিবারণকে সে ফুল দিয়ে পূজো করেছে। নিবারণের পছন্দ করা মাতাল পাত্র– অসম্ভব!

সারারাত মশা ছারপোকার সঙ্গে যুদ্ধ করে অনিদ্রায় চারটি প্রহর কাটিয়ে ভোরবেলায় বিশু রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। মুমূর্ষু রোগীর যাতনা ও হাহাকার তার সারা সত্তায় মাখানো। ছুঁচ পড়লে আওয়াজ পাওয়া যায় এমনি নিস্তব্ধতা চারিদিকে। ঘুম ভাঙা বা ক্লান্তি ঝরা শব্দ ভেসে আসছে পাখীদের ছোট্ট বাসা থেকে। দ্রুত পথ হেঁটে এসে সে দাঁড়ালো শেফালীদের খিড়কীর দরজার সামনে। কি একটু ভাবলো। এক মিনিট চুপ করে দাঁড়ালো, এপাশ ওপাশ একবার দেখে নিলো।

এবার দরজার কড়া নাড়ালো। আর একটু জোরে নাড়ালো দ্বিতীয়বার।

দরজা খুলে গেল। কণ্ঠা বার করা হাড়-জিরজিরে শরীরটাকে

ছাপা শাড়ী দিয়ে মুড়ে শেফালী দাঁড়ালো সামনে। কোটরাগত দুটো চোখের ভিতর জ্বলজ্বল করছিল এক আশ্চর্যেব চিহ্ন।

—বাবা কোথায়? একটা জরুরী কথা ছিল।

—বাবা ঘুমোচ্ছে। ডাকবো? ভিতরে আসবে না?

বিশু ভিতরে ঢুকতেই সামনের দিকে ঝুঁকে শেফালী একটা প্রণাম কবলো। পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় বুলিয়ে ধীরে প্রশ্ন করলো এতদিন আসোনি কেন?

—সব বলছি—হঠাৎ প্রণাম করলে কেন?

ম্লান হাসি হেসে শেফালী বললো, আজ আমার জন্মদিন। --আশীর্বাদ করবে না?

আশীর্বাদের পর্ব শেষ করে বিশু ঘবে এসে বসল।

শেফালীর বাবা মুকুলবাবু ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করলেন—এতদিন কোথায় ছিলে?—ভালো আছো তো?

—গিয়েছিলাম ক্ষীরগ্রামের যোগছ্যা মন্দিরে। সতীর পায়ের আঙুল পড়েছিলো ঐখানে। খুব জাগ্রতা দেবী। মহা-পীঠস্থান।

—বাঃ! বেশ ভালো খবর। মাঝে মাঝে তুমি এলে এই বর্ধমানের বহু খবর পাই।—কি দেখলে সেখানে?

—ওখানে আছে ক্ষীরখণ্ড নামে শিব লিঙ্গ। যোগদ্যা মা হচ্ছেন দশভূজা দেবীমূর্তি। গ্রামের ক্ষীর-দিঘীর জলে এই মূর্তিকে সারা-বছর ডুবিয়ে রাখা হয়। বৈশাখী সংক্রান্তির দিন ঐ দেবীকে তুলে মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐ সময় দর্শনার্থীর ভীড় হয় প্রচুর। ঐ দেবীর নাম আগে নাকি ভদ্রকালী ছিল। ইনি ছিলেন মহী-রাবণের রাজ্যে। হনুমান ঐ মহী-রাবণকে বধ করে ঐ দেবীকে ঘাড়ে করে এনে এই ক্ষীর গ্রামে রেখে গেছেন।

—তাই নাকি? হতেও পারে। সত্যি বিশু, এই অতীত ইতিহাস, দেবদেবীর নানা খবর শুনতে কত ভালো লাগে। দুঃখ কোথায় জানো ভাই,—এই শ্রদ্ধা, বিশ্বাস আর ভক্তি থেকে আমরা ক্রমশঃ দূরে চলে যাচ্ছি। আলো ছেড়ে আমরা ছুটছি অন্ধকারের দিকে। তাই

দেখবে সর্বত্র ধ্বংস লীলা। পল্লীর, প্রকৃতির মাঝে এই যে ঐতিহ্য আর স্মৃতি চিহ্ন, এগুলোর সংস্কার করা আমরা বোকামী বলে মনে করি।

—এবারে বর্ধমানের লোকাচারের কথা বলি। বৈশাখ মাসে এই পূজো হয় বলে গ্রাম বাসীরা ঐ মাসে মাটীতে লাঙ্গল দেয়না। ঢেঁকিতে শস্য ভাঙে না, জুতো পরে না, ছাতা মাথায় দেয় না। ঐ মাসে প্রাণভরে শুধু অতিথি সেবা করে।

ভালো, ভালো। শেফালীর জন্য কোথাও খোঁজ করলে নাকি?

আজ্ঞে, হ্যাঁ। খোঁজ করেছি কিন্তু পাইনি তেমন। আজ আপনাকে একটা ব্যাপারে সতর্ক করে দিতে এলাম। দেরী হলে সব পণ্ড হয়ে যাবে।—ও ব্যাটা পাত্রেব কি বোঝে মাথামুণ্ড! এক অশুদ্ধ ভোগে মেতে সারা সমাজকে দূষিত করে এবার আসছে আপনার কাছে।--ও হচ্ছে মস্ত শয়তান।

কে আসছে? কার কথা বলছো তুমি?

—দেখুন মাষ্টারমশাই, ঐযে মদের দোকানদাব নিবাবণ। ও আজকে আপনার কাছে আসবে একটা পাত্রের খোঁজ নিয়ে। খবরদার রাজী হবেন না। আমি বহু খুঁজেছি। আজকে আবার বেরুচ্ছি। আপনি মানুষকে শিক্ষা দান করে যে পুণ্যি করেছেন, উপরওয়ালা তার হিসাব রাখবেন। কোন ক্ষোভ করবেন না, নিরাশ হবেন না। শেফালীর বিয়ে খুব ভালো পাত্রের সাথেই হবে।

—এ খবর তুমি জানলে কি করে?

— একজন নয়, দুজন বলেছে সে কথা।

—কে তারা?

—একজন সাধু, অন্যজন ফকির।

—কোথায় থাকেন তারা?

--থাকেন এই বর্ধমানের প্রাচীন কীর্তির আশেপাশে। তালিত গড় থেকে গুস্করা যাবার পথে পাবেন একশো আট শিব মন্দির। অবশ্য একশো ন'টা মন্দির আছে। যেহেতু জোড়া সংখ্যা করতে

নেই তাই একটা বেশী করা হয়েছিলো। প্রত্যেকটি মন্দিরের পিছনে দেখবেন এক একটা বেলগাছ। গত পূর্ণিমায় গিয়েছিলাম ঐ একশো আট শিব মন্দিরে। এক নামকরা সাধু এসেছিলেন সেখানে। তিনি বলেছেন এ বিয়ে আটকাবে না, এছাড়া ঐ যে পীর বাহারম আছে শুনেছেন?

—নাম শুনেছি। সেটা কি জিনিষ?

—জিনিষ নয়। শুনুন। খুব ধার্মিক, ভারতের নামকরা দার্শনিক এবং নানা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এক ফকির,—তুর্কীস্থান থেকে দিল্লী হয়ে বর্ধমানে এসেছিলেন। তাঁর আসল নাম হজরত কাজী বাহারম্ সেক্কা। এই শহরের এক হিন্দু সাধু জয়পাল তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। বর্ধমানে চারদিন থাকার পর ঐ ফকির মারা যান। জয়পালের বাগানে ঐ ফকিরকে সমাধি দেওয়া হয়। তাহলে বুঝতে পারছেন, সেই থেকে হিন্দুর বাগানে মুসলমানের ঐ সমাধিস্থান হিন্দু মুসলমান উভয়েরই একটা তীর্থক্ষেত্র হয়ে গেল। সকলের মতো আমিও সেখানে দীপ জ্বালিয়ে এলাম। ঐখানেই পেলাম এক বৃদ্ধ ফকিরকে। তিনিও বলেছেন ঐ একই কথা।

—তবে নিবারণের ব্যাপারে তোমার এত আতঙ্ক কেন? আমার সাথে আজ পর্যন্ত যে শত্রুতা করতে এসেছে সে পরম মিত্রের কাজ করে গেছে। আমি এখানে খুবই নোতুন। বাড়ী আমার তারকেশ্বরে—হুগলী জেলায়।—তোমার বাড়ী কোথায়?

—আমার বাড়ী—সব বাড়ীতেই। ঠোঁটে পাত্‌লা হাসি মাখিয়ে বললো বিশু।

দরজার আড়ালে হঠাৎ চুড়ির শব্দ শোনা গেলো।

—এখন কোথায় যাবে তুমি?

—দু-একটা জায়গায় যাবো ঐ পাত্রের খোঁজে। প্রথমে যাবো সর্বমঙ্গলা বাড়ী।

—সর্বমঙ্গলা বাড়ীর নাম শুনেছি। খুব নামকরা জায়গা ওটা।

—নামকরা মানে! মহিষমর্দিনী দুর্গা। খুব ঘটা করে পূজো

হয়। অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে আগে ওখানে একটা কামান দাগা হতো। সেই কামানের আওয়াজ শুনে—বর্ধমানের সর্বত্র পূজোর বলি আরম্ভ হতো। মেষ বলি দিয়ে শুরু করে প্রায় দেড় হাজার পাঁঠা বলি হয় ওখানে। এখন কামানটা বোধ হয় অকেজো হয়ে আছে।

—তাই নাকি?—আচ্ছা বিশু, এই বাংলায়, মানে বর্ধমানের রাজারা সব মেহেতাব্। এরা তো বাঙালী নয়। এরা কোথাকার বাসিন্দা?—বাংলার রাজাবা বাঙালী হলো না কেন?

—দেখুন মাষ্টার মশাই বেশী লেখাপড়া করিনি। এসব খবর হয় খুব বৃদ্ধদের কাছে কিংবা পুরোণো বইয়ে পাবেন।—আপনি রাজবাড়ী গেছেন কখনোও?

—আমি রাজবাড়ী চোখের দেখা দেখেছি। গাড়ীতে গিয়ে নেমেছি আবার ঐখান থেকেই গাড়ীতে উঠেছি। বর্ধমান ইউনিভার্সিটি তো ঐখানেই! ঐ রাজবাড়ীর গায়ে দেখলাম একটা ষ্ট্যাচু। তাতে লেখা আছে বনবিহারী কাপুর।

—একটা গাছতলায় ষ্ট্যাচুটা দেখেছেন তো! বিরাট গাছ। ওটা বকুল গাছ। দেখবেন ওতে সাতটা মোটা মূল শাখা। প্রতি শাখায় আছে অনেক ডালপালা। প্রতিটি ডালে আছে শতশত পাতা। প্রতি পাতায় জড়িয়ে আছে সহস্র স্মৃতি। ঐ একটি পাতার ইতিহাস আপনাকে বলতে পারি।

--তার মানে--বেশ মজার কথা বললে তো?

– ঐ গাছতলায় থাকে এক ছাতা সারাবার মিস্ত্রী। নাম আবদুল মান্নান। সে আমায় যতটুকু বলেছে ততটুকুই জানাবো। সম্রাট আকবরের রাজত্বের সময় লাহোর থেকে সঙ্গম রায় নামে এক মহাজনী ব্যবসাদার বর্ধমান এসেছিলেন। তার দুই নাতি আবু রায় ও বাবু রায়। ঐ আবু রায় হলেন বর্ধমান বাজারের আদায়কারী দরওয়ান। এই আবু রায়-ই হচ্ছেন প্রথম রাজা। তারপর তার নাতি কৃষ্ণরাম রায়, তারপরে জগৎরাম রায়—এইভাবে শেষ রাজা উদয় চাঁদ রায়।

এক সময় ভারত সরকার সব জমি খাস করে নিলেন। রাজত্বের হলো অবসান।

—কিন্তু আবু রায় রাজা হলো কি করে? মুকুলবাবু জানতে চাইলেন।

—সে বেশ মজার ঘটনা।—কটা বাজলো বলুন তো?

—এখন সোয়া ছটা।—খুব তাড়া আছে নাকি?

—না, তাড়া নেই, তবে—আটটার সময় নিবারণ আসবে বলেছে সঙ্গে পাত্রকেও আনবে। এবার শুনুন। আকবরের রাজ্যে এক কর্মচারী ছিল। নাম গিয়াস বেগ। বেগের একটি মেয়ে ছিল—মেহের-উন্নিসা। মেহের বলেই সকলে ডাকতো। পরে এর নাম হয়েছিলো নূরজাহান। দারুণ সুন্দরী সে। ওর রূপে আকৃষ্ট হয়ে আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর ওকে বিবাহ করতে চাইলেন। সম্মানের প্রশ্ন ছিল—তাই পিতা আকবর মেহেরের সাথে বিয়ে দিলেন তাঁর এক সেনাপতি শের আফ্‌গানের। বিয়ের পর জাহাঙ্গীরের নজর থেকে মেহের ও আফগানকে দূরে রাখতে পাঠিয়ে দিলেন বর্ধমানে। আফগান, হলেন বর্ধমানের শাসনকর্তা। এদিকে দিল্লীর সম্রাট হয়েই জাহাঙ্গীর তার সেনাপতি কুতুব-উদ্দিনকে পাঠালেন বর্ধমানে। হুকুম করলেন,—ছলে-বলে-কৌশলে ঐ মেহের-উন্নিসাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে হবে। ঘোর যুদ্ধ হলো। কুতুব প্রথমে মরলো। কুতুবের সৈন্যের হাতে আফগানকেও মৃত্যু বরণ করতে হলো। দুই যোদ্ধার সমাধি দেওয়া হলো একই জায়গায় পাশাপাশি।

—তারপর? মুকুলবাবু মুগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

এই যুদ্ধে বর্ধমান তছনছ হয়ে গেল। বহু সৈন্য মরলো, গাড়ী ঘোড়া সব হলো শেষ। সেই সময় ঐ আবু রায় অনেক লোকজন ও কিছু সৈন্য সাথে করে দুটো পালকীতে মেহের ও তার কন্যা ল্যাড্‌লীকে চাপিয়ে দিল্লী পৌঁছে দিয়ে এলো। সেই থেকেই আবু রায় খুব প্রসিদ্ধ হয়ে পড়লো।

—বাঃ! তোমার তো সারা বর্ধমানের ইতিহাস মুখস্থ দেখছি হে!

তোমায় ছাড়তে ইচ্ছা করে না বিশু। আমি কিন্তু তোমার পথ চেয়ে বসে থাকবো। শেফালীর বিয়ের ভার তোমার উপরেই ছেড়ে দিয়েছি, বললেন মুকুল বাবু।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিশু মুকুলবাবুর শেষ কথাটি চিন্তা করছিলো।·· তিনি বিশুর পথ চেয়ে বসে থাকবেন,—শেফালীর ভার বিশুর হাতেই রইলো! আজ পর্যন্ত সে নিরানব্বইটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। কারো অভিভাবক তো ভুলেও এই ধরণের কথা বলেননি। তাহলে কি···না—না তা হ'তে পারে না! বিশুর হয়তো বুঝবার ভুল। বিশু দু-তিনবার ভাবলো। উনি কি শেফালীব সাথে বিশুর বিয়ে দিতে চান নাকি! সেরকম ইচ্ছাও থাকতে পারে তো! কথাটা ভালো করে যাচাই করে নিতে বিশু আমতা আমতা করে বললো দেখুন মাষ্টার মশাই, আপনি বিবেচক ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। আপনার কন্যা শিক্ষিতা। ওর ভার নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কথাটা আরেকবার ভেবে দেখুন। মনের অভিপ্রায় একটু বিচার করুন।

—ভাবনা ভাবার কাজ উপরওয়ালার। সবই ভবিতব্য। কে কার বিচার করে? মঙ্গলময়ের ইচ্ছাই আমাদের মানতে হবে। আমি সত্যিই ওর জন্য খুব চিন্তায় আছি। আমি একা, বড় অসহায়। —তোমাকে এ ভার নিতেই হবে। স্পষ্ট করে বললেন মুকুলবাবু।

—ঠিক আছে। তবে একটা কথা কি জানেন? মানে, আমার ছন্নছাড়া জীবনে এমন কিছু নেই যা দিয়ে কারো ভার নিতে পারি। তবে আপনি যখন ভবিতব্য মানেন, তখন আমি ফিরে আসি। অন্য কোন ভালো পাত্র না পেলে ওকে বিয়ে করে আপনার শেষ আশা পূরণ করবো।

— আগুনে ঘি পড়লো। উত্তেজনার আলোড়নে চিৎকার করে খাট থেকে লাফিয়ে নামলেন মুকুলবাবু। রণং দেহি মূর্তি নিয়ে বললেন, কি বললে? তুমি শেফালীকে বিয়ে করবে? লম্পট, ভণ্ড, জানোয়ার কোথাকার! চাল নেই, চুলো নেই, অশিক্ষিত গেঁয়ো। তাই অন্ধকারে চুপিসারে চোরের মত এসেছো খিড়কির দরজা দিয়ে!

তাই নিবারণের পছন্দ করা পাত্রের উপর ভাংচী দেবার এত চেষ্টা তোমার! ঘটকালি তোমার মুখোশ! বেরিয়ে যাও বাড়ী থেকে। কুঁজোর আবার চিৎ হয়ে শোবার সখ!

—বাবা! শেফালী ঘরে ঢুকলো।

—বলো।—মুকুলবাবুর কণ্ঠে উত্তেজনা।

—চা এনেছি বাবা!

—না, চা দিতে হবে না। যাও!

—দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বিশু বললো, মাফ্ করবেন, আমি আপনার কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারিনি। সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন।

কথা শেষ করা হোলোনা।—ঝড়েব বেগে ছুটে এসে বিশুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুকুলবাবু বললেন, বেরিয়ে যাও বাড়ী থেকে। এব পর এ বাড়ীতে এলে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়াবো, পুলিশ ডাকবো।

বাড়ার উঠানে ছিটকে পড়ল বিশু। ধীরে উঠে বললো, আপনি আমায় মারলেন কিন্তু আমি নির্দোষ। কথা বলা শেষ কবে সে খিড়কীর দরজা দিয়ে পা পা করে বেরিয়ে গেলো।

* * *

দশ মিনিট পরের ঘটনা। দুর্বিপাকের নির্মম ধাক্কা তখনও স্তিমিত হয়নি। নীচতা, হীনতা ও ক্রূরতার লড়াই-এর জের মিটতে আরো কিছু সময় বাকী ছিলো। হঠাৎ সদর দরজার কড়া নড়ে উঠলো, খুট্-খুট্-খুট্।

ভ্রম, লজ্জা ও রহস্যের নানা পথগামী সূক্ষ্ম চিন্তাধারাকে ধূপের ধোঁয়ার মত সারা ঘরে ছড়িয়ে দিয়ে দ্রুত দরজা খুলে মুকুলবাবু প্রশ্ন করলেন,—কি চাই?

—চিনতে পারবেন কিনা জানিনা, আমি নিবারণ।

—বুঝলাম। হঠাৎ এই অসময়ে?

—অসময়ে! পরের স্বার্থে যখন আসি তখন এই জ্ঞানটা লুকিয়ে রাখি। আপনার কন্যার জন্যে একটি পাত্রের সন্ধান এনেছি।

—ও। বলুন, কেমন পাত্র? বয়স কত? বাড়ী কোথায়?

--একটু বসতে দেন তো সবিস্তারে বলা যেতে পারে।

-আসুন। মুকুলবাবু মনে মনে লজ্জা পেলেন।

বিশুব ছেড়ে যাওয়া চেয়াবটায বসে নিবাবণ বলল, কেমন আছেন? সময অভাবে এ দিকে আব আশাই হয় না।

-বলুন, পাত্রটি কেমন? গম্ভাবভাবে মুকুলবাবু বললেন।

পাত্রেব পিতা ডাক্তাব। আদি বাড়া কাটোযার এক গ্রামে। তিনি অবশ্য গ্রামে বড একটা থাকেন না।

-তা—না থাক্—পাত্র কোথায থাকে?

পাত্রেব মাতাব বাপের বাড়ী...।

-পিতা মাতাব খবব জানবাব দবকাব নেই। মুকুলবাবু জোবে বললেন।

দবকাব নেই বললে চলবে কি কবে। আসল খববই তো ঐ বংশ পবিচয়ে

বেশ, বলে যান।

বাপ নাম কবা বিলেত ফেবৎ ডাক্তাব। ডাক্তারদেব ব্যাপার-তা। ওনাব চবিত্র বহস্যাবৃত। পাত্র কিন্তু নির্লোভ, নিষ্পাপ আব নির্লিপ্ত। ছেলেব চবিত্র বাপেব মত নয়। বাপ চলেন দক্ষিণে কিন্তু ছেলে চলে উত্তবে বক্তেব সম্পর্ক থাকলে কি হবে, বাপ আব ছেলে সম্পূর্ণ আলাদা।

—সে আবাব কেমন ব্যাপাব।

- ব্যাপাবটা কি জানেন? ছেলে বাপকে চেনেনা আবাব বাপও ছেলেকে চেনেন না। আসলে পাত্র তাব বাপকে দেখেনি। নিজের বংশ পবিচয সে জানেনা—তাই ঐ প্রসঙ্গে কেউ প্রশ্ন করলে চুপ থাকে।

—ব্যাপাবটা বড় হেঁয়ালীতে ভবা। সবকিছু একটু খুলে বলবেন?

শুনুন, সব বলছি। কাটোযাব গোমাই গ্রামে বিখ্যাত কাটামুণ্ড দেবী পূজো হয়। বেলা এগাবোটা নাগাদ একটি শঙ্খচিল উড়ে এসে ঐ দেবীর মন্দিরের উপর ঘুরতে থাকে। ঐ চিল দেখে

তবে পূজো আরম্ভ হয়। চিল আবার চলে যায়। ঐ চিল আবার আসে এক বিরাট জলাশয়ের উপর। তাকে দেখে তবে ঐ দেবীর বিসর্জন হয়। সারা বছর কেউ ঐ চিলকে আর দেখতে পায় না!

--আঃ আপনি আবার চিলের ইতিহাস শোনাতে বসলেন। পাত্র তার বংশ পরিচয় জানে না—এ আবার কেমন কথা?

—তাইতো বলছি। ওই কাটামুণ্ডু পূজো করেন যে পুরোহিত তাঁর এক ভাই-এর বাড়ীতেই পাত্র মানুষ হয়েছে।

—আপনি তো গোলক ধাঁধায় ফেলে দিলেন মশাই! ডাক্তারের ছেলে মানুষ হলো পুরোহিতের ভাই-এর বাড়ী।—পাত্র এখন কোথায়? মুকুলবাবুর কণ্ঠে বিস্ময় ঝরে পড়ল।

এখন মানে—গতকাল সে গিয়েছিলো এই শহরের গোদাশিব মন্দিরে পূজো দিতে। ঐ গোদা বা মোটা শিবের নাম হচ্ছে বর্ধমানেশ্বর। প্রতি মাসে সে ঐ মন্দিরে একবার করে যায়। বড় ঈশ্বর নির্ভর পুরুষ সে।---আরে মশাই শিবের চেহারা তো নয়, যেন পাহাড়! চারু দে মশাই-এর বাসস্থান খুঁজতে গিয়ে ঐ শিব পাওয়া গেছে মাটীর নীচে।---হায় ভগবান! ক্রেণে করে ঐ শিব তুলতে যেয়ে দুবার ক্রেণের চেন ছিঁড়েছে। নিবারণ নিজের মনেই হেসে উঠলো!

—আহা - সে তো বুঝলাম। পাত্রের লেখাপড়া, চাকুরী, চেহারা কোন খবরই পেলাম না। আপনি বসে বসে শুধু ক্রেণের চেন ছিঁড়ছেন!

—হায় ভগবান! তার সমস্ত পরিচয়ই আপনাকে দেবো, কিন্তু আগে প্রতিজ্ঞা করুণ ওকে পছন্দ হোক আর না হোক, এই পরিচয়ের গোপন খবর কারো কাছে প্রকাশ করবেন না। এমনকি, তার কাছেও এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন রাখবেন না।

—এতো মহা ফ্যাসাদে ফেললেন দেখছি। বেশ, প্রতিজ্ঞা করলাম। মানে সব ব্যাপার একটু খুলে বলুন। বুঝতেই তো পারছেন কন্যা দায় -গ্রস্ত পিতার জ্বালা কত।

—সব বুঝতে পারছি। আমার একান্ত অনুরোধ এই আসল

ঘটনা কোনভাবে কারো কাছে ফাঁস করবেন না। আমার কথার প্রতিটি বর্ণ বিশ্বাস করবেন। আমি আপনার কোন ক্ষতি করতে আসিনি।

—বেশ, বলুন।

—পাত্রের পিতা চলার পথে একজন নার্সকে ভালোবেসেছিলেন। মহিলারও কোন দোষ নেই। মেলামেশা একটু বেশী হবার জন্য তারা একটু ভুল করে ফেললেন। যা না হবার তাই হলো। বিবাহের আগেই ঐ ছেলেটি জন্ম নিল। শহরের এক নার্সিংহোমে ওকে ফেলে রেখে ডাক্তার ঐ মহিলাকে বিবাহ করে নতুন করে সংসার পাতলেন।

--বলেন কি !—আপনি কি করে জানলেন এখবর ?

--সব বলবো। বলতে যখন এসেছি—কিচ্ছু লুকোবো না। —কার্জন গেটের নাম শুনেছেন ?

—শুনেছি।

—ঐ গেটের কাছাকাছি একটি নামকরা নার্সিং হোমে আমার নিজের পিসীমা আয়ার কাজ করতেন।

—পিসীমার খবর এখন থাক। বলুন ডাক্তারের খবর।

—ডাক্তার এখন থাকেন আসানসোলে।

—বাপ আসানসোলে আর ছেলে বর্ধমানে !—কোথায় থাকে ? হোস্টেলে না কোনো আত্মীয়ের বাড়ী ?—চাকরী করে, না ব্যবসা ?

—দেখুন মাষ্টারমশাই, আমি ঘটক নই, তাই হয়তো সব কথা গুছিয়ে বলতে পারছি না। আপনাকে যা যা খবর দেবো সব মন দিয়ে শুনবেন। নার্সিং হোম থেকে ওই পরিত্যক্ত ছেলেটিকে পিসীমা চেয়ে নিলেন।

—কেন ?

—মানুষ করবেন বলে ! তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁর স্বামী থাকতেন গ্রামে। মানুষ করবেন বলে তিনি প্রথমে আমাকেই কাছে রেখেছিলেন। এখন নিয়ে এলেন ঐ শিশুকে। তখন আমার বয়স ন' বছর। শিশুটিকে বুক থেকে নামিয়ে পিসীমা সব ঘটনা বলে-

ছিলেন। আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনেছিলাম। বুঝে ছিলাম এবার আমার আদর যাবে কমে।

—বুঝেছি পাত্র তাহলে আপনার পিসীমার কাছে মানুষ?

—না—তাও নয়। সে আর এক ঘটনা। শিশুকে বাড়ীতে আনার পর আমাদের বেশ ভালোই কাটছিলো, কিন্তু পাঁচ বছরের মাথায় পিসেমশাই মারা গেলেন। তখন আমার বয়স চোদ্দ।

—কি হয়েছিলো পিসেমশাই-এর?

—মাঠে চাষ করতে গিয়ে সর্পাঘাতে মারা যান। আমাকে অ-লক্ষ্মী বলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। তারপর থেকে পাত্রকে আমি আর দেখিনি। শুনেছিলাম ছেলেটির বয়স যখন সাত, তখন পিসীমা মারা গেলেন। ঐ সোনার টুকরো ছেলে মনের দুঃখে ঘর ছেড়ে কোথায় যেন চলে গেল। কেউ খোঁজও নেয় নি. আমিও আর কোন খবর পাইনি।

—মুকুলবাবু অধৈর্য হয়ে পড়লেন। প্রশ্ন করলেন, শেষকালে কোথায় পাওয়া গেলো তাকে?

—পাওয়া গেলো আমার গ্রামে। নিজেই এসে হাজির হলো। তাকে দেখলাম একদৃষ্টে। যেন গৌতমবুদ্ধ সারা মুখটিতে যেন চাঁদের প্রতিফলন। দুটি চোখের একটিতে চেতনা আর অপরটিতে তপস্যা। মাথা ন্যাড়া করে এসেছিলো। আমার দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো। নিজেই নিজের পরিচয় দিলো প্রশ্ন করলাম মাথা ন্যাড়া কেন রে? বললো, নিবারণদা, আমার পিতৃবিয়োগ হয়েছে।

—সে আবার কি?

—যে সাধুবাবা আমায় মানুষ করেছিলেন তিনি দেহ রাখলেন। তাঁর এক শিষ্যের বাড়ী গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, বড় হয়েছিস্, জনসেবা করে দিন কাটাবি। কাউকে কষ্ট দিবি না। একা থাকবি।

—কোথায় থাকে সে?

—পিসীমার বাড়ীর চাবিটা তাকে দিয়েছিলাম। ঐখানেই থাকে।

—পাত্রের বয়স কত ? মুকুলবাবুর প্রশ্ন বড় আশাবাদী।

—আমার চেয়ে ন' বছরের ছোট। হিসাব করুন, আমি এখন একান্ন।—আপনার বয়স কত হলো মাষ্টারমশাই ?

—দেখতে কেমন ?

—সুন্দর,—একমাথা ঝাঁকড়া চুল আর কাঠখোট্টা শরীর। —হবে না কেন ? সকাল সন্ধ্যা স্তোত্র পাঠ আর সারাদিন কাঁধে ঝোলা নিয়ে সারা বর্ধমান চষে বেড়ানো। এমন সমাজ সেবক, পরোপকারী আর পরমভক্ত মানুষ আর দেখা যায় না।

—ঝোলা কাঁধে ঘোরে কেন ?—ভিক্ষা করে নাকি ?—রাঁধে কে ? —খায় কোথায় ?

—ভোজনং যত্রতত্র -শয়নং কুঁড়ে ঘরে। ঝুলিতে থাকে তার গুরুজীর দেওয়া দু-খানা ধর্মগ্রন্থ। নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, সৎ প্রবৃত্তি আর কুসংস্কার মুক্ত মানুষটিকে যদি জামাই করেন তাহলে দেখবেন পঞ্চাশ-খানা গ্রামের লোক আপনাকে ধন্য ধন্য করবে। তার মুখে সর্বদা একটি শ্লোক শুনবেন—চণ্ডাল চণ্ডাল নয় যদি কৃষ্ণ বলে, বিপ্র, বিপ্র নয় যদি অসৎ পথে চলে।

—দরজার আড়াল থেকে চুড়ির শব্দ শোনা গেল।

—হুঁ, ছেলেটি ভালোই মনে হচ্ছে।—কোন উপায় সুপায় করে না ? সংসার চালাবে কি করে ?

—কাজ করে—অনেক কাজ করে। গাজনে জিভে লোহার বাণ ফুটিয়ে আগুনে ঝাঁপ দেয়। এছাড়া শ্যামা কীর্ত্তন আর হরি কীর্ত্তনের দল নিয়ে এখানে ওখানে গাইতে যায়। ওর কীর্ত্তন আমি দু-বার শুনেছি। গাইতে গাইতে সেও কাঁদে তার সাথে শ্রোতারা কাঁদে আরও বেশী।

—আমাদের গ্রামে কখনো এসেছে সে ?

—কতোবার এসেছে। আজকেও আসবে আপনার বাড়ী। সে এলে চারিদিকে সোনার হাতি দেখার মত হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এলে আলাপ করে দেখবেন। তার মুখে সদা নম্র, অমায়িক, শিশুসুলভ

হাসি। দুটো চোখের দৃষ্টিতে ভাসা ভাসা প্রশান্ত মৈত্রী ভাব। অনাসক্ত, নিস্পৃহ, উদার ও মহৎ চরিত্রের মানুষ সে। যেন নররূপী নারায়ণ।

—কতদূর লেখাপড়া ?

—গুরুগৃহে যতটা সম্ভব শিখেছে।

—ঠিক আছে,—কখন আসবে সে ?

—এতক্ষণ তো এসে পড়ারই কথা। মনে হয় লজ্জায় আসতে পারছে না! যাই, ওকে ধরে নিয়ে আসি। কথা শেষে নিবারণ উঠে দাঁড়ালো।

—তাড়াতাড়ী আসবেন। সবই মায়ের ইচ্ছা।

—বাবা, শেফালী ডেকে উঠলো।

—বলো, মা।

—চা করেছি, নিয়ে আসবো ?

—নিশ্চয়ই আনবে।—এতক্ষণ আনিস্‌নি কেন ? দেখেছেন,—কথা বলতে বলতে সব ভুলে গেছি।

শেফালী চা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই নিবারণ বলে উঠলো, একটু অপেক্ষা করো মা, ওকে নিয়ে আসি, দুজনে এক সাথেই খাবো। আজ একটু মিষ্টি মুখও করবো। আসবার সময় ঐ মিষ্টিটা আমিই কিনে আনবো।

—শেফালী ফিস্‌ফিসিয়ে বললো—সে হয়তো আর আসবে না!

—নিবারণ চীৎকার করে বললো, আ-আসবে না? আলবৎ আসবে। আমার কথা এড়িয়ে যাবার সাহস তার হবে না। এই কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে আছে সে। দু-মিনিটের মধ্যেই ধরে আনছি। নিবারণ ঝড়ের বেগে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো। যেতে যেতে বললো, ব্যস্ত হবেন না, ওকে এক্ষুণি নিয়ে আসছি।

—খুব খুশি মনে মুকুলবাবু শুধালেন, যে পাত্রের কথা বলছিলো তাকে তুই দেখেছিস্ সেফু!

—শেফালী দাঁড়িয়ে রইলো মাথা নিচু করে।

—তুই চিনিস্ তাকে ?—চুপ্ করে রইলি কেন ?

—চিনি—! শেফালীর কণ্ঠে অস্ফুট উচ্চারণ।

—চিনিস্ ? কোথায় দেখেছিস্ ?—আমি চিনি তাকে ?—প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে মুকুলবাবু দু'পা এগিয়ে এলেন।

—চেনো।—ঐ তো সকালে এসেছিলো।—বিশুদা!

—বিশু! মানে ঐ ঘটকটা! নররূপী নারায়ণ। মুকুলবাবু পিছনে হাত মোড়া হয়ে মেঝেতে পায়চারী করতে লাগলেন।

দু মিনিট। দু ঘণ্টা। দু প্রহর পেরিয়ে গেলো। নিবারণ এলোনা। এলোনা বিশুও। দু-টো দিন কেটে গেলো দেখে মুকুলবাবু সত্যিই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তার মনে পড়লো বিশুর শেষ কথাটুকু—আমায় মারলেন,—আমি নির্দোষ। নিবারণও বলেছিলো, অমৃত-গরল, নিন্দা-স্তুতি, প্রিয়-অপ্রিয়—বিশুর কাছে সবই সমান। মুকুলবাবু অনুভব করলেন কন্যার দগ্ধ হৃদয়ের আর্তনাদ। সাধা লক্ষ্মীকে তিনি পায়ে ঠেলেছেন। আর দেরী নয়। তিনি বেরিয়ে পড়লেন নিবারণের খোঁজে। বিশুর কাছে তিনি হাত জোড় করে ক্ষমা চাইবেন।

বেশ খানিকক্ষণ হেঁটে তিনি এলেন নিবারণের গ্রামে। এই রাস্তার শেষ প্রান্তের মোড় ঘুরলেই সেই রাস্তা। সেই রাস্তায় আছে নিবারণের মদের দোকান। এই হিমেল শীতের সাঁঝে মুকুলবাবু খুব ধীরে হাঁটতে লাগলেন। তিনি চলেছেন মদের দোকানে। ঠিক এই সময় তাঁর স্কুলের অনেক ছাত্র হয়তো ওখানে এসে হাজির হয়েছে। ছিঃ ছিঃ! এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। একদিকে বিশুর ঘটক জীবনের লাঞ্ছনা অন্যদিকে নিবারণের ব্যর্থতা। বিশু হয়তো আফশোষে বা অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলেছে,—কিন্তু নিবারণ এলোনা কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর নিবারণকে দিতেই হবে। ভুল তো সব মানুষেরই হয়। এর কি ক্ষমা নেই···।

···যাক্ বাঁচা গেল।—নিবারণের দোকান বন্ধ। দোকানের ভিতরেই থাকে নিবারণ। কোন কারণে আজ নিশ্চয়ই পূর্ণ দিবস বন্ধের দিন। মুকুলবাবু ধীরে এসে দাঁড়ালেন দোকানের দরজার

সামনে। গ্রামের নির্জন সন্ধ্যা। এপাশ ওপাশে ঝিঁঝি পোকার ডাক। এবার তার কড়া নাড়ার পালা। ঘর থেকে বেরিয়ে নিবারণ যদি প্রশ্ন করে, এই অসময়ে কেন?

দোকানের সামনে একটি ছোট্ট ঝোঁপের পাশে একটা ক্ষীণ শব্দ শোনা গেলো। চমকে উঠে মুকুলবাবু দম বন্ধ করে একদৃষ্টে সেই দিকেই চেয়ে রইলেন। দেখলেন এক অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি। মূর্তিটা ধীরে পা-পা করে তার দিকেই এগিয়ে আসছে।—কে আসছে? নিবারণ নাকি? বিশুও হতে পারে! হ্যাঁ বিশুই তো! মূর্তি আরও কাছে এগিযে এলো. জানা অজানা পাঁচমিশালী ভীতিতে মুকুলবাবুর শরীরে মৃদু শিহরণ আরম্ভ হলো। বিশুকে কি জবাব দেবেন তিনি? না—এ বিশু নয়। একেবারে কাছে এসে দাঁড়ালেন এক বৃদ্ধ। ঘাড় তুলে ধীরে প্রশ্ন করলেন, কতদিন ধরে এই নেশা করেছেন মাষ্টার মশাই? নিবাবণকে খুঁজতে এই তিন দিনে কতবার এসেছেন?

মুকুলবাবু নিশ্চল হয়ে দাঁড়ালেন। তার হৃদয়ে শিহরণ, চেতনায় বিস্ফোরণ!

বৃদ্ধ বললেন, গত তিনদিনে পঞ্চাশবার এসেছি! বন্ধ দোকানটা দেখে নেশাটা একটু শান্ত হয়। নেশার বড় জ্বালা দাদা! শালা গেল কোথায়? যাবার আগে যদি আমায় গুলি করে মেরে রেখে যেতো!—কাছে আছে নাকি? এক কৌটা দিন না।

নিরুত্তর হয়ে শুধু দর্শক সেজে দাঁড়িয়ে রইলেন মুকুলবাবু।

বৃদ্ধ উত্তেজিত হয়ে বললো, ঐ তালাটা ভেঙে দিতে পারেন? আসুন না দুজনে শেষ চেষ্টা করি একবার। ভিতরে অনেক মাল জমে আছে। কথা দিচ্ছি কিচ্ছু নেবো না। শুধু একটু চেটেই চলে আসবো। তিনদিনের পচা মাল। উঃ! মস্ত তালা লাগানো! তা-না হলে···!

মুকুলবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, একটা পিতলের বড় তালা মোটা শিকলের সাথে জড়াজড়ি করে দরজায় ঝুলছে। তিনি এক-

রকম লাফ দিয়েই পিছু ঘুরলেন। দ্রুত হেঁটে চললেন বাড়ীর পথ ধরে। মনে প্রশ্ন জাগলো, নিবারণের দোকান তিনদিন ধরে বন্ধ কেন?

গত তিনদিন বিশুর খোঁজ করেছে অনেক লোক। বিশু আর নিবারণের অন্তর্ধান অনেকে জানতে চেয়েছে অনেকের কাছে। এ রহস্য একমাত্র মুকুলবাবুর জানা। প্রথমে ভুল হলেও এখন তিনি বিশুকে চিনেছেন। চিনেছেন নিবারণকেও। গ্রহের পিছনে উপগ্রহের মত নিবারণ নিশ্চয়ই ছুটে চলেছে গ্রাম থেকে গ্রামে—দেশ থেকে দেশান্তরে। কথা দিয়ে গেছে, যেমন করেই হোক বিশুকে সে ফিরিয়ে আনবে। নিবারণ কখনও মিথ্যা বলে না।

বিশুকে চিনেছিলো আরও একজন সে ঐ শেফালা। সেদিন ভোরে প্রণাম সেরে সে কান পেতে শুনেছিলো বিশুর মুখনিসৃত আশীর্বাদ। বিশু স্পষ্ট করে বলেছিলো, এয়োস্ত্রী হও, দীর্ঘজীবি হও। কে জানে বিশুর ঐ অন্তরের বাণীকে সফল দেখতে হতভাগী শেফালীকে আর কতকাল ধৈর্য্য ধরে থাকতে হবে? দু'টো ঝরা পাতার মিষ্টি স্বপ্ন কি এ জীবনে বাস্তবে রূপ নেবে?

———

স্মৃতির অন্তরালে

উনিশশো অষ্টআশির তেসরা জানুয়ারী। রবিবার রাত্রি চারপ্রহর।

ভবানীপুরের শশাঙ্ক চ্যাটার্জীর গৃহের সামনের বাগানটায় দু-দল কীর্তনীয়া বসেছে কীর্তন গাইছে। একদল গাইছে কালী কীর্তন, অন্যদল ধরেছে হরি কীর্তন! প্রথমদল শুরু করলে, দ্বিতীয়দল বিশ্রাম নেয়। এইভাবে তারা গান করেছে রাত বারোটা পর্য্যন্ত। গানের সুর, ভাষা সাড়ম্বরে প্রচার করেছে—হে জগৎবাসী, তোমরা কেউ অধম নও। প্রেমভক্তি মিশিয়ে শান্তভাবে, উদ্বেগশূন্য হৃদয়ে যদি তাঁর পায়ে নিজেকে সঁপে দাও তাহলে সব আশা মিটবে। সব সুখ তোমরাই ভোগ করবে।

কীর্তনীয়াদের অগ্রিম কিছু টাকা দেওয়া হলেও—রাত পোহালে বাকী টাকা শোধ দেওয়া হবে—এই হয়েছে শর্ত।

শশাঙ্কবাবু ধীরে এসে ঢুকলেন গৃহের লম্বা ঘরটায়। এক নজরে আভ্যন্তরীণ দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। একটা পুঁটলি থেকে কিছু সরষে পড়ে গেলে সেগুলো কতদূর গড়াতে পারে তা তিনি জানতেন না। এই ঘরে তিন পুত্র আর তিন জামাই জড়াজড়ি করে একসাথে ঘুমোচ্ছে।

বড় জামাই নামকরা সরকারী ইঞ্জিনিয়ার। সামান্য অহঙ্কার আর ভয়ানক দেমাক তার মনে বাসা বেঁধেছে।

মেজো জামাই আর্থিক অনটনে পঙ্গু। কাজ করে বাগমারীর একটা ছোট কারখানায়। বিয়ের আগে হেরোইন ভক্ত ছিলো। এখন হেরোইন ছাড়লেও ভুগছে নানা রোগে। থাকে বস্তির একটা বাড়ীতে। মেজ মেয়েকে বহুভাবে সাবধান করেও কোনো ফল হয়নি। ভালবেসে ঐ ছেলেটিকে বিয়ে করে আজ পর্যন্ত সে একটা ভাল—বাসাও জোটাতে পারেনি। স্বামীর বেতন সাতশো পঁচিশ টাকা। ওভারটাইম কিছু পায়। ছেলেমেয়েগুলো রিকেটগ্রস্ত।

ছোট জামাই ডাক্তার, কিন্তু একটি পুত্র আশা করে দুর্ভাগ্যবশত: পরপর তিনটি কন্যা পেয়েছে। জেদ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে চতুর্থ কন্যার জন্মের পর। আর সন্তান হয়নি।

শশাঙ্কবাবুর তিন পুত্র। যেন তিনটি রত্ন। বড়টি নামকরা প্রাইভেট কোম্পানীর অফিসার। তিনি আবার পার্টি করেন। দু-দিক থেকেই তার পয়সা আসে। তাই সচ্ছল অবস্থা।

মেজ ছেলে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। কাজ বেশী করতে হয় না। সরকারী কণ্ট্রাক্টর। বিল লিখে বেশ দু-পয়সা উপায় তার। পয়সার গরমে বড় আর মেজ বৌ প্রায়ই লড়াই করে। দুজনের স্বামী শুরুতে এই ঝগড়া বিবাদ থেকে থাকতো দূরে। হঠাৎ একদিন যা না হবার তাই হোলো। দু-ভাই হাতাহাতি করে অল্প বিস্তর আহত হোলো। মেজ ছেলে নতুন বাড়ী কিনে অন্যত্র চলে গেলো, স্ত্রী আর তিন ছেলে মেয়ে নিয়ে।

ছোট ছেলে সত্যই সুদর্শন। এক মেয়ের মা, তাকে জালে জড়িয়ে জামাই করেছেন। সে ঘর জামাই হয়ে থাকে—আর শ্বশুরের ব্যবসার তদারকি করে। এ বাড়ীতে সে বড় একটা আসার সময় পায় না।

তার বদলে আসেন তার শ্বাশুড়ী সুতপা দেবী। মাঝে মাঝে এসে হাজির হন। গল্প করেন খোঁজ খবর নিয়ে বিদায় নেন। আলট্রা মর্ডান তিনি। শরীরে হীরে-পান্না-সোনা ঝোলে নিয়মিত। সুন্দরী আর আঁটোসাটো গড়নটি তার বয়স ঢেকে রাখে। হাতে করে তিনি নিয়ে আসেন নামকরা লেখকের লেখা নভেল কিংবা উপন্যাস!

বিপত্নীক শশাঙ্কবাবু এ বাড়ীতে থাকেন একা। এতদিন বড় ছেলের কাছেই ছিলেন কিন্তু অজানা কোনো কারণে সে ছেলেও তাকে ছেড়ে চলে গেছে! কেউ বলে অফিস, স্কুল কলেজ বহু দূর —তাই। পাড়াপড়শীরা বলে, শশাঙ্কবাবু ছেলের সংসারের পূর্ণ দায়িত্ব নিতেন না। দু-একজন ইসারায় জানিয়েছে—ঐ ছোট বেয়ান সুতপা দেবীর আসা যাওয়া বড়ছেলের ঠিক পছন্দ হয়নি। দুর্মুখরা বলে,

শশাঙ্কবাবু হয়তো কোনো দুর্বল মুহূর্তে বড় বৌমার আঁচল ধরে টেনেছিলেন।

যে যা খুসী বলুক। একা এসেছেন—একা থাকবেন—এই কথা চিন্তা করে তিনি একাই থাকতেন শূন্য বাড়ীতে। ইদানিং তার প্রেসারটা একটু বেড়েছে তাই দৌড়াদৌড়ি কিংবা তিন চার তলায় সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে ওঠা বন্ধ করেছেন। তা-না হলে হাত, পা, চোখ কোমর প্রায় আগের মতোই কাজ করে।

কিছুদিন হোলো শতসহস্র অস্পষ্ট চিন্তা তার মনের সবকটা দরজায় মৃদু ধাক্কা দিচ্ছে। কিন্তু দরজা বন্ধ দেখে একটু ঘোরাঘুরি করেই সব ফিরে যাচ্ছে। ফাঁক ফোকর দিয়ে যেটুকু চিন্তা ভিতরে ঢুকেছে তাদের খাতিরেই আজ তার গৃহে শুরু হয়েছে এক অভিনব মহোৎসব। এই উৎসবে যোগদান করতে হাজির হয়েছে পুত্রকন্যারা। এসেছে জামাইরা—বৌ-মায়েরা। ছ-টি বেয়াই-বেয়ানও স্ব-শরীরে হাজির। কুটুমবাড়ীর রাতদিনের ঝি চাকরেরা আসতে ভোলেনি। বাড়ী জমজমাট। যেন বাজার বসেছে এই গৃহে।

শশাঙ্কবাবু হালকা নজর বুলিয়ে উঁকি মারলেন মাঝের ঘরটায়। এখানে হাত পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছেন ছ'জন বেয়ান। প্রৌঢ়া বৃদ্ধাদের শোবার কায়দা সাধারণতঃ এলোমেলো। সারা ঘরটাতে নাসিকা গর্জনের গুরুগম্ভীর আওয়াজ। এক বেয়ান স্থূলা—অন্য একজন বেতো রুগী। একজন বয়সের ভারে কুঁজো—কেউ আবার হাপাঁনীতেও ভুগছেন। ভালমন্দে মিশানো তারা। স্বল্পভাষী বা খিট্‌খিটে মেজাজের দু-জন। ছোট বেয়ান চিরকাল যেন একরকম। জজের কন্যা তিনি। ব্যারিস্টারের স্ত্রী, তাই তার দু-হাত ভরা থাকে মা লক্ষ্মী।

এবার তিনি এলেন কোণের ঘরে। বাপরে ছ'জন! সবকটি জাঁদরেল বেয়াই। বহু পয়সা—দু নম্বরী কারবার!

মেজ মেয়ের শ্বশুর রোগা আর খর্বকায়। গেঞ্জীর কারখানায় কাজ করেন তিনি। শশাঙ্কবাবুর বাড়ীতে তিনি প্রায়ই আসেন। এক

সাথে ভোজন, বিশ্রাম, আলাপ সেরে বাড়ী ফেরেন। প্রতিবার যাবার সময় দয়ার দান হিসাবে যা পান্ নিয়ে যান। এতে তার অভাবের সংসারে একটু সাশ্রয় হয় বৈকি!

তেসরা জানুয়ারীর পুরো দিনটা সবকটি বেয়াই বন্দুকধারী সৈনিক সেজে সারা বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরেছেন। ছ'-বেয়ানও সশস্ত্র পুলিশের মত পাহারা দিয়ে চলেছেন চারিদিকে।

* * *

আজই শশাঙ্কবাবু মারা যাবেন ৩। মৃত্যুদিন। ঐ মৃত্যুর আগমন রহস্য উপভোগ করতে সকলে এসেছে দলে দলে। চারিদিকে শক্ত বেড়া! বেহুলার চেষ্টায় বহু ত্রুটি ছিল। তাই সজল নয়নে লক্ষ্মীন্দরকে নিয়ে অনেকদিন ভেলায় চেপে ঘুরতে হয়েছিলো। সাবিত্রী সত্যবানকেও এই চেষ্টা চালিয়ে মৃত্যুকে দূরে রাখতে হয়েছিলো।

সেই মৃত্যুর কথা চিন্তা করে শশাঙ্কবাবু আজ নিজের চারিদিকে রেখেছেন সু-বন্দোবস্ত। এ যেন গরুর গাড়ীর বদলে বেগবান স্পুট্নিক ব্যবহার করা হয়েছে। দু-একজনকে সঙ্গী হিসাবে না রেখে তিনি বাড়ী ভরিয়ে তুলেছেন তিনশো আত্মীয় বন্ধু আর কুটুমদের ডেকে। যেন রাজার ছেলের বিয়ে।

প্রচুর আয়োজন। যাবতীয় প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, তেল মশলা ঘি, আনাজ এসেছে বাজার থেকে। রাত পোহালেই সব দেনা শোধ হবে। রকমারি মিষ্টি এসেছে অতিথি আপ্যায়নে। মাছওয়ালা পাঠিয়েছে সেরা মাছ। আজকালকার মুখরোচক প্রসিদ্ধ খাবার প্রণ-বল, কাটলেট্ আর চিকেন চাউমেন পাঠিয়েছে রেষ্টুরেন্টের মালিক। প্রচুর টাকার বিল হয়েছে। দেনা মেটানো হবে রাত পোহালে।

তেসরা জানুয়ারীর রাত বারোটার পর সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। যার মৃত্যুকে ঠেকাতে দু-চারজন পিসি মাসী আর দিদিমা সারাদিন উপবাস করে ঈশ্বরকে ডেকেছেন সেই মানুষটির চোখেই আজ ঘুম নেই।

ঘুম মানেই শ্বাসটানা মৃত্যু। সে তো মৃত্যুরই সামিল। তাই শশাঙ্কবাবু নিদ্রাদেবীর ছোঁয়া এড়িয়েই সময় কাটাচ্ছেন। চিন্তার ঝড়ের ঝাপটা, চিন্তার বাণের বিঁধুনি আর ঐ দুঃশ্চিন্তার আগুনের জ্বলুনি তাঁকে অম্লান বদনে হজম করতে হয়েছে! জোর করে চোখ দুটো খোলা রেখে তিনি ভেবেছেন বাল্যবন্ধু অরিণ চক্রবর্তীর কথা।

অরিণ চক্রবর্তী আমেরিকাবাসী। বহুদিন পর ভারতে এসে সে শুনেছে সবকিছু। তাই এসেছে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। আজ এই রহস্যাবৃত ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে সে ছুটে এসেছিলো বেলা বারোটায়।

—এসো ভাই,—কেমন আছো? বলেছেন শশাঙ্কবাবু।

—ভাল আছি। তুমি কেমন আছো? ব্যাপারটা কি বলোতো! মানুষ—জন্ম-দিবস, বিবাহ-দিবস পালন করে নানা কায়দায়। এই মৃত্যুদিনের উৎসব যেন—নতুন ব্যাপার!

ভাবনায় বিভোর শশাঙ্কবাবু এসে ঢুকলেন কোণের ঘরটায়—না এ ঘরে তিনি যাবেন না। এখানে ঘুমোচ্ছে তিন মেয়ে—তিন বৌমা—আর তাদের একদল বংশধরেরা।

ঘুমোচ্ছে সকলে। পিসি, মাসী, মামীমা, দিদিমা,—যে যেখানে পেরেছে সার বেঁধে শুয়েছে। অনেকে একটু বেশী রাত করে বাড়ী ফিরে গেছে। বারান্দা, রান্নাঘর, ভাড়ার এমন কি ঠাকুর ঘরেও তিল ধারণের স্থান নেই।—সারা বাড়ীটাকে যেন ঘুমে পেয়েছে!

সম্রাট অশোক কলিঙ্গ দেশ জয় করে আনন্দের বদলে ব্যথা পেয়েছিলেন রণক্ষেত্র দেখে! সেখানে সকলে লুটিয়ে পড়েছিলো রক্তাক্ত কলেবরে! তিনি আঁতকে উঠেছিলেন মৃত নগরী দেখে। শশাঙ্কবাবু ব্যস্ত হলেন মৃত না হলেও ঘুমন্তপুরী দেখে। মনে হোলো কোনো এক মন্ত্র বলে মৃত্যুর করাল ছায়া সবাইকে ঘুম পাড়িয়েছে। এবার হয়তো তার পালা। ধীরে ঐ মৃত্যু আসবে তাকে এই ধরাধাম থেকে টুক্ করে তুলে নিতে!

অরিণের সন্দেহ মেটাতে তিনি জানতে চাইলেন কেন, তুমি শোনোনি সে ঘটনা ?

—শুনেছি ! কিন্তু তুমি তো অতীতে এসব বিশ্বাস করতে না ! আমি ছুটে এসেছি শুধু তোমার মুখ থেকে সবটুকু শুনতে।

সত্যিই বিশ্বাস করিনি। তবে কি জানো, আমায় আষ্টে-পিষ্টে বেঁধে কে যেন অহরহ চাবুক দিয়ে পেটাচ্ছে। একা মার খেয়েছি—একাই দমবন্ধ করে সেই যাতনা-জ্বালা সহজভাবে সহ্য করেছি। আজ চুপ থাকতে পারিনি। মৃত্যু বা অপমৃত্যুর কবলে নিজেকে সহাস্যে ও সজ্ঞানে সঁপে দেবার পূর্বমুহূর্তে দেখ্‌ছো না কত সুন্দর ব্যবস্থা নিয়েছি !

—সুন্দর ব্যবস্থা— ! কথাটা সত্যি ?—তিনজন পুরোহিত ডেকে শ্রাদ্ধাদির আগাম ব্যবস্থা, প্রায়শ্চিত্তকরণ এবং পছন্দমত খাদ্য ভক্ষণ ইত্যাদির কাজ শেষ হয়েছে ? বেহালার ন'-বৌদির হাতের রান্না গুগলীর দো-পিয়াজী, মেজবৌদির পাঠানো কাঁচা পোস্তবাটা মিশিয়ে কুমড়ো ভাতে, রাঙ্গাবৌদির বান্না, চিংড়ির ইংলিশকারী ছাড়াও আরো পনেরো রকম ব্যাঞ্জন দিয়ে আহার শেষ করেছেন তিনি।—এরই নাম আগাম শ্রাদ্ধ খাওয়া !

খেলোয়াড়, সাহিত্যিক, গুণীজন এবং বহু বন্ধুবান্ধব এসে বহু ইতিহাস, তথ্য আর শ্লোক আওড়ে গেছেন। এমন পাকাপোক্ত, তেজোদীপ্ত সজাগ মানুষ কি করে মারা যেতে পারেন একথা ভেবে আতঙ্ক ও অস্থির চিত্তে বাড়ী ফিরেছেন প্রাণের বন্ধু হীরেণ বাগচী। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াকু সৈনিক এবং সু-নীতির পূজারী এমন একখানা তাজা প্রাণ কখনই শেষ হতে পারে না একথা অনেকেই জোর দিয়ে বলেছেন।

শশাঙ্কবাবুর মনে যে কথাটা গেঁথে বসেছিলো সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলো বন্ধু অরিণ চক্রবর্তী।

—টাকা পয়সা, সম্পত্তির কি ব্যবস্থা করেছো ? এ কথা অরিণই প্রথম জানতে চাইলো।

—সে সব সু-বন্দোবস্ত করেছি। ছ'টি ছেলেমেয়ে এই বাড়ীটার দখল নিয়ে লড়বে তাই এটাকে বিক্রী করে দিয়েছি এক কালোয়াড়কে। সে পজেসন নেবে আমার মৃত্যুর ছ'দিন পরেই। টালিগঞ্জের জমিটা তাড়াহুড়ো করে বেচেছি। ব্যাঙ্ক ফাঁকা করে সব টাকা একত্রে জড় করে ছ'ভাগ করে রেখেছি, ছ'টা প্যাকেটে নাম লিখে। ছ'জনই এসেছে ছদিন আগে থেকে। খালি হাতে এসেছে —ফিরে যাবে ভরা হাতে।

—বেশ ভালো ব্যবস্থাই করেছো। এখন অসুবিধা কি হচ্ছে তোমার? অরিণ সহানুভূতি মাখানো কণ্ঠে শুধালো।

—কোনো অসুবিধা নেই। শুধুই অপেক্ষা। সবই অদৃষ্ট ভাই! এমন জ্বালা ক'জনকে ভোগ করতে হয় বলো? মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে আমার মৃতা স্ত্রীর আত্মা যেন কোনো এক অচেনা স্তর থেকে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ত্রিশ বছর আগে মৃত পিতা যেন—'শঙ্কু চলে আয়—কোনো অসুবিধা নেই এখানে'—বলে ডাকছেন। প্রেসারটা বেড়েছে, কোমরে একটা ফিক্ ব্যথা, এছাড়া মানসিক দুর্বলতা। মানে সব সময় এক অস্বস্তিকর পরিবেশ!

ঠিক ঐ সময় বৃদ্ধারা সমস্বরে কেঁদে উঠেছেন। তাঁরা সারাদিন উপবাস করে শুদ্ধ মনে প্রার্থনা করছিলেন। শশাঙ্কর দুর্গতির কথা চিন্তা করে—শশাঙ্কর আনমনা স্বরে যাই, যাই কথা শুনে তারা খুবই ব্যথা পেয়েছিলেন।

—যমের ডাকে না আছে দয়া মায়া আর না আছে আপ্যায়ন। সামনের দিকে ঝুঁকে বললো অরিণ। পরে আগ্রহ ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—বালিতে জল ঢালছো বটে কিন্তু জল কি দাঁড়াবে? তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি—তুমি জানলে কি করে যে তুমি আজকে মরবে?

—ও-হো-হো, সে কথা শোনোনি তুমি?—বলছি।

—সংক্ষেপে বললেই হবে!—বললো অরিণ।

—স্বপ্নে, দূত মারফত।

—তার মানে ?

—বল্‌ছি। ধীর স্বরে শশাঙ্কবাবু শুরু করলেন। সেটা আজ তিন বছর আগের কথা। স্ত্রী মারা যাবার ছ'মাস পরের ঘটনা। একটু থামলেন তিনি। সদাহাস্যময় মুখটিতে প্রশান্তভাব ফুটিয়ে তুলে বললেন, বেশ নীরোগ, সুস্থ ছিলাম সেদিন। সেটা তেসরা জানুয়ারী, রবিবার - উনিশশো পঁচাশি সাল। ভোর চারটে।

এখবর জানা থাকলেও নোতুন করে শোনার আগ্রহে জগন্নাথ পুরোহিত, দুজন বেয়াই, ছোট বেয়ান আর বৌদি তিনজন আশে পাশে ভীড় জমালো। ছোট জামাই ষ্টেথিস্‌কোপ ঝুলিয়ে এসে প্রেসার চেক করলো। বললো, প্রেসার বেড়েছে। কথাটা একটু আস্তে আর সংক্ষেপে বলুন। তারপর সে দলের লিডারের মত ঐ ভীড়ের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে রইলো। শশাঙ্কবাবু বলে চললেন, দেখলাম স্বপ্ন! ভয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠলাম! এ দুনিয়ার হাজার স্পৃহা, অসন্তোষ আর অভিশাপ নিশ্চয়ই আমার পিছু নিয়েছিলো। তা না হলে এমনটি দেখলাম কেন ?

—কি দেখলে ? অরিণ তাড়া দিলো।

দেখলাম, আমার ভেজানো দরজাটা দুম্‌ করে খুলে গেল! দুটো অস্পষ্ট মূর্তি এসে দাঁড়ালো আমার মাথার কাছে। একজন মিশকালো - অপরজন সাদা ফুট্‌ফুটে। মুহূর্তের মধ্যে তারা মিশে একাকার হয়ে গেল। মূর্তির মুখে ম্লান হাসি। দৃষ্টিতে বিষণ্ণ ভাব।

—কে তুমি ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—আমি জ্যোতিষী। আমি জন্ম, মৃত্যু, দূত। একটা খাতা পেন্সিল দাও। হিসেব করে তোমার সারা ভবিষ্যৎ বলে দেবো।

—জ্যোতিষ মানেই যাদুকর—আমি যাদুকর বিশ্বাস করিনা।

—করতেই হবে। দেখছো-না, রোগ, শোক, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব এক-যোগে তুলেছে মহা-ঝড়! তোমার মনের বাসনা, কামনা, দাবী আর সাধনাতে লাগছে ঐ ঝড়ের ঝাপটা। তৈরী হও, তোমায় যেতে হবে।

—কোথায় ?

—যেখানে নিয়ে যাবো। পরপারে—ঐখানে।—মূর্তি উর্দ্ধ গগন দেখালো। পরে বললো, আমি সর্বব্যাপী আর সর্বসম্মত এক অসম্পূর্ণ শক্তি। এই ধূলিময় নরকভোগ তোমার শেষ হয়েছে। জন্মেছো সহস্রবার, মরেছো সহস্রবার। মনে রেখো আর মাত্র তিনটে বছর বাকী। তৈরী হও!—মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেলো।

—ধড়মড়িয়ে উঠলাম।—এটা কিসের ইঙ্গিত? মনে মনে হরি ভজনা করলাম। দমে যাইনি। তাঁর চরণে নিজেকে নিঃশর্তে সঁপে দিলাম। মনে মনে উচ্চারণ করলাম—

সর্ব ধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

—বাঃ! এই তো সাধুবাদ। এত সুন্দর কনসেপ্‌সন নিয়ে, এমন সুন্দর জীবন জ্ঞান থাকা সত্বেও এত ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন?

মেজো বেয়াই নবকুমারবাবু ঘাড় তুলে নিজের মত প্রকাশ করে বললেন, ব্যাপারটা কি জানেন? এসব ঘটনা ঝেড়ে ফেলতে হয়। এসব কথা যে যত ভাবে, চলার পথে বাধা তত বেশী জোরদার হয়ে ওঠে। মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য এই অপ-প্রয়াসের কি প্রয়োজন? শুদ্ধপ্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা তো আপনার আছেই। সব পরিস্থিতিতে আপনাকে মনের বল অটুট রাখতে হবে।

চোখে চকচকে হীরে ঝলসানো দৃষ্টি এনে বললেন শশাঙ্কবাবু—ছিয়াশির তেস্‌রা জানুয়ারীর ভোরে আবার দেখলাম সেই স্বপ্ন!!

—একই স্বপ্ন? একই দিনে? মানে দ্বিতীয়বার! অরিণ জানতে চাইলো।

ইয়েস্, একই দিনে, ভোর চারটের সময়। মূর্তি নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো মাথার পাশে। মাথায় হাত ঠেকিয়ে বলল. ঠিক এক বছর পরে আবার এলাম। দুঃখ পেয়োনা, চঞ্চল হয়োনা আর আমায় অবিশ্বাস কোরোনা। তোমার আয়ু আর দু-বছর। পাল গুটিয়ে নাও,—ডাঙ্গা দেখা দিয়েছে!

—অবশ্য একটা কথা মানি। আমরা রক্তমাংসের মানুষ তো।

এ যেন মন, প্রাণ, হৃদয় ও অনুভূতিকে দগ্ধ করে তিলে তিলে হত্যা করা। দুঃখ করে বললো অরিণ।

—ঠিক তাই, নিজেকে পরিপূর্ণভাবে তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে ক্রমশঃ বড় একা, দুর্বল ও নার্ভাস হয়ে পড়তে লাগলাম। আমি যে একা, আমি যে সাথীহীন।—আমি যতই হোক—বৃদ্ধ তো!

—পব পর দুবার দেখলে—সেইটেই চিন্তা। অরিণ বললো।

দুবার নয়—তিনবার। সাতাশির তেসরা জানুয়ারীর ভোরে আবার সেই স্বপ্ন! মূর্তি বললো, অনেকে ঠাট্টা করবে, হাসবে কিন্তু মনে রেখো জগৎ মিথ্যা কিন্তু জ্যোতিষ সত্য। সামনের বছর আসবো শুধু পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে।

সত্যিই কি তুমি জ্যোতিষ বিশ্বাস করো?

—করতাম। তখন টাউনস্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ি। একদিন বেশ তাড়াতাড়ি স্কুলে চলেছিলাম পরীক্ষা দিতে। এক আধা সন্ন্যাসী হঠাৎ আমাব পথ রোধ করে দাঁড়ালো। মাথায় তার মস্ত জটা। কাঁধে গেরুয়া ঝোলা। আমার কপালে দুটো আঙুল ঠেকিয়ে বললো, বেটা, তোর ভাগ্য খুব ভাল আছে! এই দেখ্!

দেখলাম তার হাতে একটা ছোট বাঁধানো মা কালীর ছবি। আমি যেন কেমন বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম।

—বেটা, তুই দান কর। শুনে রাখ্ আমার কথা! রোজ স্নানের সময় তুই প্রস্রাব করিস কেন? এটা বন্ধ কর। দে দু-দশ পয়সা এই ঝুলিতে। তুই ক্লাসে ফার্স্ট হবি।

—তুই দিলি পয়সা?

—দিলাম। টিফিন খাবার দুটো পয়সা দিয়েছিলাম। তাকে বিশ্বাস করেছিলাম—তাই।

অরিণ হাসলো। ছোট বেয়ান বললেন, এ—মা, আপনি দেখছি জ্যোতিষের অপমান করছেন!

—না। আমি তা করিনি। শুনুন, আর একটা ছোট ঘটনা। ছোটোরা একটু বাইরে যাও তো!

একদল বেরিয়ে গেলো।

তখন আমি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। কেমন করে জানিনা পাড়ার উৎপল ব্যানার্জীর বাড়ীর ঝি রাণুকে ভালবেসে ফেললাম। বারান্দা থেকে ওর দরজা দেখা যেতো। সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। থলি নিয়ে সে বাজার করতে যেতো। নানা ভান করে ওর পিছু নিতাম! সে পিছু ঘুরে আমায় দেখত, হাসতো।

একদিন তাকে চকলেট দিলাম। নেবেনা কিছুতেই। শেষে মুচকী হেসে বলল, কেউ দেখলে কি ভাববে? আমি কোনো উত্তর দিইনি।

সে একবার আমায় দুটো লজেন্স আর একটা বড় এলাচ দিলো। আমি ওগুলো একসাথে চিবিয়ে গিলে ফেললাম। ও আমার দিকে চেয়ে সব দেখে বেশ মিষ্টি করে হাসলো।

প্রায়ই ভাবতাম ওর কথা। আমি তখন আঠারো—তার বয়স ছিলো পনেরো। এই খেলা নিয়ে দিন ভালই কাটছিলো।—শশাঙ্কবাবু একটু দম নিলেন।

—তারপর? অরিণ প্রশ্ন ছুঁড়লো।

—একদিন এক বন্ধুকে সংগে নিয়ে এলো ছোট মামা। ঐ বন্ধুটি হঠাৎ আমার ডান হাতটা ধরে উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলো।

—কি দেখছেন? জানতে চাইলাম।

ছোট মামা বললেন—আরে বাব্বা,—ও হচ্ছে নাম করা জ্যোতিষী! দেখ্‌না, তোর ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দেবে।

জ্যোতিষী বললেন, তোমার পথে এসেছে রাহুর দৃষ্টি। বৃহস্পতি তোমার ভালো। তোমার সু-দিন আসছে। বাধা দূর হয়ে যাবে—খুব শীঘ্রই। শনির কবল থেকে বাঁচতে চাও তো রোজ দুটো করে নিমপাতা খাও।

চারদিন পরে ঝি রাণুর সঙ্গে দেখা হোলো বাজারের সামনে। ঐখানেই লজেন্স চকলেট দেওয়া নেওয়া হোতো। সে মাথা নিচু করে দাঁড়ালো। দৃষ্টিতে তার বিষণ্ণ ভাব।

—কি হোলো? কথা বলছো না যে!

—আমার ছুটি। চললাম বাড়ী!—

—তার মানে?

—ব্যানার্জী মেসো তাড়িয়ে দিয়েছে।

—কেন?

—আমি নাকি তরকারী চুরি করে খেয়েছি।

সে চলে গেলো কাটোয়া। আমার গ্রহও কেটে গেল। তাই বলছিলাম এক সময়ে জ্যোতিষ বিশ্বাস করতাম।

অরিণ বললো, এসব ঠাট্টা করে গল্প ফেঁদেছো। আমি জানি তুমি কখনই জ্যোতিষ বিশ্বাস করতে না।

—ঠিক তাই। করতাম না—করিও না। শোনো বলি ছোট্টো দু-টো ঘটনা।

আমার বড়দার মেয়ের বিয়ে ভাল পাত্র। কুষ্টি নেই বলে হাওড়ার নাম করা জ্যোতিষের কাছে গেলেন দাদা। সংগে আমি আর ভাইঝিটিও গেলাম।

জ্যোতিষ বললেন—এখন বিয়ে দোবেন না, বৈধব্য যোগ আছে। তিনবছর অপেক্ষা করুন—নচেৎ আপশোষ করবেন। দাদার হোলো সাপের ছুঁচো গেলার মত অবস্থা।

তাকে সাহস দিলাম। যুক্তি দিয়ে উৎসাহিত করলাম। তর্ক করে তাকে বোঝালাম। কোথাকার কে একজন জ্যোতিষ! নব-দম্পতির ব্যাপারে তিনি কিনা ভবিষ্যৎবাণী দিলেন। কার কখন কোথায় কিভাবে মৃত্যু হবে তা বলার ক্ষমতা কোনো মানুষের নেই। আরে বাবা—ভাল পাত্র পেয়েছেন। এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে মনের জোর নিয়ে শুভ কাজ শেষ করে দিন।

হোলোও তাই। মানে বিয়ে হোলো। আজ ত্রিশ বছর ধরে সেই ভাইঝি সংসার করছে মহাউল্লাসে।

—এরকম অনেক ঘটনা শুনেছি আমি। বলল অরিণ।

শেষ ঘটনাটা শোনো। কলকাতার এক কুমারীর হাত দেখলো

চিত্তরঞ্জনের এক নামকরা জ্যোতিষ। বললেন, হাতের সবই ভাল কিন্তু বিবাহের আশা ক্ষীণ। বিবাহরেখা একেবারের অস্পষ্ট। দুঃখের কিছু নেই। সংসার জীবন না করে দশের জন্য কাজ করতে হবে। আশ্রমবাসী কিংবা সন্ন্যাসিনী হবে সেই কুমারী।

চিত্তরঞ্জন থেকে ফিরে সেই কুমারীকে সাথে নিয়ে তার পিতা ঘুরেছেন অনেক আশ্রমে। মাথা ন্যাড়া করে থাকতে হবে কুমারীকে। —তার মা বলেছেন—বাপ্‌রে, এ দৃশ্য দেখতে পারব না!

নিরামিষ খেয়ে সারা জীবন কাটাতে হবে—! কুমারী বলেছে অসম্ভব।

তিন হাজার টাকা দিলে তবে আশ্রমে নেওয়া হবে।—পিতার হাতে তা ছিল না।

শেষকালে আমারই সাথে বিয়ে হয়েছিল ঐ কুমারীর। একচল্লিশ বছর সংসার করে, ছ'টি সন্তান রেখে সে চলে গেল আমায় ফেলে রেখে!

গুড্‌লাক্‌ উইশ ইউ বলে, অরিণ চলে যাবার পরই ঐ বাড়ীর এক ডজন এবং সাতটি নাতি-নাতনী শশাঙ্কবাবুকে ঘিরে ধরেছিলো। সত্যিই সৌভাগ্যবান দাদু! একটি নাতি বা নাতনি হয়নি বলে বহু দাদু—ছেলে বা ছেলের বউকে এবং শেষে নিজেকে ভাগ্যহীন ভাবেন। বলেন এসব কর্মফল। কিন্তু এখানে কার সৌভাগ্য আর কে অভাগা তা বিচার করা বড় কঠিন ব্যাপার।

দাদুর পিঠ জড়িয়ে দুজন—দু-টো হাত ধরে, দুজন করে চারজন—হাঁটুর উপরে—কোলে চারজন। তিনজন পায়ের গোড়ালীর কাছে। দাদুকে ঠিক যেন মনে হচ্ছিলো কাঁঠাল গাছ—যার নীচ থেকে উপর পর্য্যন্ত ঝুলছে ছোটো বড় কাঁঠাল।

পিঙ্কি হচ্ছে বড় ছেলের ছোটো মেয়ে। সে সরাসরি প্রশ্ন করলো, দাদু, তুমি কখন মরবে গো?

এ প্রশ্নে যম পর্য্যন্ত আঁতকে উঠে। দাদু নিজের আতঙ্ক চেপে

রেখে বললেন,—কেন গো দিদি? আমি মরলে তুমি বুঝি সুখী হবে? আনন্দ পাবে?

—জানিনা যাও।—জানলেও বলবনা।

—বলোনা গো দিদি। শুধু আমায় বলো। কা—উ—কে বলবো না। কানে কানে বলো।—বলবে না তো!

—বলবো—না।—এই তোরা কেউ বলিস্ নি যেন।

ছোট মেয়ের মেয়ে পুতুল, দাদুর গলা জড়িয়ে ধরে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, শোনো দাদু—তুমি মরলেই বড়মাসী পিঙ্কিকে চারগাছা সোনার চুড়ি বানিয়ে দেবে বলেছে। আর আমার মা বলেছে আমরা বস্তীর বাড়ী ছেড়ে এই বাড়ীতেই থাকবো। তখন আমাদের অনেক টাকা হবে।

ফিস্‌ফিস কথাটা সকলেই শুনে ফেলল। আর পায় কে? শুরু হোলো মনের গোপন কথা ফাঁস করে দেবার প্রতিযোগিতা।

এক প্যাকেট ধানি পটকার একটাতে আগুন লাগালে ঠিক এমনিই হয়।

—ও দাদু শোনো, শোনোনা, বাবা আমাকে সাইকেল দেবে বলেছে।—কাশ্মীরে বেড়াতে নিয়ে যাবে—মা বলেছে মাস্টার রেখে নাচ-গান শেখাবে। জানো দাদু, আমার বাবা একটা মোটর সাইকেল কিংবা স্কুটার কিনবে। বোম্বে যাবো—দিদিমার সাথে সাউথ ইণ্ডিয়া ঘুরতে যাবো।

শশাঙ্কবাবু প্রচণ্ডভাবে আহত হলেন। আঘাত হয়তো সামলে নিতেন কিন্তু শেষ কোপটা তাকে শেষ করল। কানে যেন গরম শিশা ঢেলে দিলো দু-টি বড় নাতি। তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিলো ইংরাজী ভাষায়। ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্র তারা। খুব স্মার্ট আর তুখোড় ইংরাজী বলার ক্ষমতা। তারা যা বলল, বাংলা অনুবাদ করলে তা হয়—অতএব—তুমি যতক্ষণ না মরছো—ততক্ষণ আমাদের প্ল্যান পাকা হচ্ছে না! যদি না মরো তাহলে যা যা—শুনলে সব আশা—আশাই থেকে যাবে!

দুর্বলরা সকলের কাছে মার খেয়ে, প্রতিবাদ করার চেয়ে সকলের প্রশংসা করতে থাকে। অফিসের কড়া মেজাজের সাহেব বেয়ারাকে শূয়োরের বাচ্চা বললে—বেয়ারা অনেক সময় খুসীই হয়। বন্ধুদের বলে -বাব্বা! সাহেব কারো সাথে কথাই বলেনা—আজ আমায় বলেছে এই কথা।

শশাঙ্কবাবু নিরুপায়। এরা সব রক্তের রক্ত। তিনি বলেছেন, বাঃ! বাঃ! খুব ভালো কথা। দেখি কত তাড়াতাড়ি মরতে পারি! —কথাটা একটু কেমন যেন জড়িয়ে গিয়েছিল

এখন রাত চারটে। পুরো তিনবছর কেটে গেল—তবু তিনি মরলেন না। হয়তো যমরাজের হিসাবের কম্পিউটার যন্ত্রটা হঠাৎ বিগড়েছে। কিংবা হয়তো দূতেদের গাফিলতি। তবে একটা কথা সত্যি। তিনি তার মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে হিসাব করে, ফন্দী এঁটে বহু খরচ করে পূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন।

ছোট বেয়ান একদিন দু-তিনরকম রান্না হাতে নিয়ে নিজের গাড়ী করে এসেছিলেন। তখন শশাঙ্কবাবু ষ্টোভ্ জ্বেলে একটু রান্নার ব্যবস্থা করছিলেন। ঝড়ের মতো হঠাৎ ঘরে ঢুকেই বললেন, খুব হয়েছে উঠুন। বাকীটুকু আমিই করে দিচ্ছি।

জজের মেয়ে, নামকরা ব্যারিষ্টারের ধনা পত্নী তিনি। এক ঘণ্টার মধ্যেই রান্না শেষ করে—নিজের আনা তিনরকম ব্যঞ্জন দিয়ে খেতে দিয়ে বলেছিলেন, দাদা, এসব একটা স্রোতের টান। দেখেননি কোনো কুটো ধারে আট্‌কে যায়, কোনোটা আবার খালের মাঝখানে আট্‌কে যায়। মনের জোর হারাবেন না—আমরা আর কতটুকু করতে পারি।

শশাঙ্কবাবু অতীত চিন্তার মাঝে বড় আনন্দ পেলেন। সত্যিই, নিঃস্বার্থে -লোকলজ্জা, লোকভয় ত্যাগ করে স্তুতপা দেবী যেন তাকে সব রকম বিপদ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছেন।—কিন্তু কেন?

সারা বাড়ী ঘুমে অচেতন। চলার পথ পাওয়া মুস্কিল। সামান্য

বুদ্ধি খাটিয়ে বাড়ীর সকলে চলার পথ রেখে শুলেও—কমবুদ্ধি ঝি চাকরগুলো সেই লম্বা চিলাতে পথে শুয়ে পড়েছে। ফলে তিনি অতি কষ্টে মাড়িয়ে, ডিঙ্গিয়ে নিজের টলমল গতি ঠিক রেখে ধীরে ঢুকলেন নিজের ঘরে। বাব্বাঃ! একটু বেসামাল হয়ে গেলেই হবে—জ্যোতিষ সত্য!

তার মতো চলাফেরার অসুবিধা হয়েছিলো আর এক দলের। তারা হোলো এক প্ল্যাটুন নেংটী ইঁদুর! একে তো বাড়ীতে লোকজন থাকলে। ওদের চলার স্বাধীনতা লোপ পায়। রাতেও তাদের যদি বেশী একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটোছুটির সুযোগ না দেওয়া হয় তাহলে তারা খাবে কি?—বাঁচবে কি করে? তাই তারা হপ্‌ষ্টেপ জাম্প, লংজাম্প, হাইজাম্প ইত্যাদি দিয়ে এক মাথার উপর থেকে অন্যজনের বুকে ঝাঁপাঝাঁপি করে সম্পূর্ণ নির্জনতাকে সরিয়ে মাঝে মাঝে মেজাজি গোলমালের সৃষ্টি করছিলো।

শশাঙ্কবাবু ধীরে আলমারীটা খুললেন। খুব সতর্কভঙ্গী নিয়ে টেনে বার করলেন ছ'ভাগে ভাগ করা অর্থের প্যাকেটগুলি। একটি বেছে নিয়ে বাকীগুলি রেখে দিলেন পূর্বস্থানে।

এবার এলেন মেয়েদের শোবার ঘরে। হাড় জিরজিরে মেজমেয়ে রেবা ঘুমিয়েছিল দরজার সামনেই। কোনোদিকে দৃষ্টি না দিয়ে তিনি খুব কাছে এসে, ঝুঁকে পড়ে ডাকলেন -রেবা, ও রেবা রেবা-আ!

চক্ষু কোঠরাগত, দাঁত দুটো বাইরে বেরুনো কঙ্কালসার রেবা কোনো ডাকই শুনতে পেলোনা! সে এখন অর্ধমৃতা যা অনেকটা মৃতেরই মতো।

শশাঙ্কবাবু সাবধানে দু'পা এগিয়ে গেলেন। ছিঃ এ ঘরে ঢোকা তার কখনোই উচিত হয়নি। কি লজ্জা! জোর করে চোখ ঘুরিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় কি? মায়ের শিক্ষা না নিলে এই দশা হয়।

রেবাকে কোল পাঁজা করে তুলে নিয়ে তিনি বাইরে এলেন। ঘুমন্ত মেয়েটাকে কোথায় রাখবেন এখন? রেবার বুক, পাঁজর, কোমর সবই যে একগোছা হাড়ের বাঁধুনি!

রেবাকে নামালেন ঠাকুর ঘরের ভিতরের কোণ্‌টায়। সারা শরীরটা ধরে নাড়ালেন। বললেন, ও রেবা—আ—আমি তোর বাবারে।

রেবা চোখ খুলে বাবাকে দেখলো। বললো, ছা-ড়ো-না—উঃ! কি যে ক—রো! উঁঃ··!

—ওরে—হাত পাত্‌। কি এনেছি দেখ্‌। এই নে—দেখি হাত দেখি—চেয়ে দেখ্‌—টাকাটা নে। এই দেখ্‌ অনেক টাকা রে! বললেন শশাঙ্কবাবু। তার কথাগুলো যেন জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হোলো রেবার কানের ভিতরে।

হাতে টাকা পেয়েই রেবার ঘুম ভাঙলো। জোর করে চোখের পাতা খুলে বলল, টা-কা-আ! এ তো অ-নেক টা-কা-আ গো! এসব কার টাকা?

তোর টাকা রে!—সবই তোব। যা এটা চুপি চুপি বাক্সে রেখে আয়। খবরদার কাউকে বলিস্‌নি। কেউ যেন জানতে না পারে। যা—আ।—রেখে আয়।

দম দেওয়া পুতুলের মত হেলে দুলে রেবা ঘরে ঢুকলো। তিন মিনিট পরে বেশ চাঙ্গা হয়ে বাইরে এলো। একবার বাবার দিকে চেয়ে দেখলো। ইসারায় বলল, রেখেছি। তারপর ধীরে এগিয়ে গিয়ে বাবাকে প্রণাম করলো।

দ্বিতীয়বার আলমারী খুললেন শশাঙ্কবাবু। একটা ধুতি বার করলেন। এক কাপড়ে তিনি হবেন গৃহত্যাগী। সেই ভালো। এতে তার মান, গর্ব এবং প্রবৃত্তি বাঁচবে। কিন্তু ছোট বেয়াম কি ভাববে? তিনি তো বারে বারে বলেছেন, ধৈর্য্য চাই দাদা, ভাববেন না আপনি একা।—যতদিন বাঁচবে—থাকবো পাশে।

শশাঙ্কবাবুর মনে পড়লো সেদিনের কথা। ছোট বেয়াম এসে-ছিলেন এই ধুতিটা নিয়ে। ভিতরে ঢুকেই বলেছিলেন—এটা পরবেন।

—আবার ধুতি কেন? তাছাড়া আপনি তো আমার জন্যে অনেক করছেন।

—ওসব শুনবো না। আমিতো কিছুই করতে পারছি না।

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো আপনাকে ?

—একটা কেন ? যা খুসী জিজ্ঞাসা করুন।

আপনি আমার জন্যে এমন করে ছুটে আসেন, রান্না করেন, নানাভাবে সাহস জোগান—কিন্তু কেন ? মানে কিছু মনে করলেন না তো !

—সুতপা দেবী ঠিক তৈরী ছিলেন না এ প্রশ্নের জন্যে। বেশ একটু ভেবে বলেছিলেন, আপনার স্ত্রী আমায় একটা কথা বলতেন, আপনি খুব ভাল স্বামী। আমি সেই রেশ টেনেই শুধু বলবো—আপনি সত্যিকারের সৎ লোক। এই সৎ সঙ্গ পেতেই ছুটে আসি। আপনাকে দেখতে আসি। কেবল যেন মনে হয় আপনার মত একজন বিপত্নীক মানুষ যেন বড় অসহায়। আপনি বিশ্বাস করুন, আমি যেন কিছুতেই না এসে থাকতে পারিনা। আপত্তি থাকে তো আর আসবো না।

—না, না—তা বলছিনা। কেবল ভাবি—এই অভিশপ্ত জীবনের ছোঁয়া যদি আপনার বদনাম ডাকে। এতে যদি আপনার কোনো ক্ষতি হয় ?

—কিচ্ছু হবেনা। আমি ওসব ভয়ও করিনা। দাঁড়ান রান্না করি। আজ একসাথে খেয়ে তবে বাড়ী যাবো।

ধুতি পরে শশাঙ্কবাবু গেলেন বেয়ানদের ঘরটায়। আরো কদর্য্য দৃশ্য। তা হোক, এ পরিবেশ থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে রাখলেন তিনি। তুবার দেখলেন সুতপাদেবীকে। সর্বাঙ্গ সুন্দর করে শাড়ীমুড়ে মিষ্টি মুদিত চোখদুটোর মাঝে তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন। দু-হাত তুলে তিনি নমস্কার করলেন। তারপর পা-পা করে এগিয়ে গেলেন সদর দরজার দিকে। যে দরজা দিয়ে যমের দূত এসেছিলো তিনবার—সেই দরজা খুলে তিনি ধীরে বেরিয়ে গেলেন। এক পা গিয়েই থমকে দাঁড়ালেন তিনি।

তিনি যা করেন তিনবার ভেবেই করেন। ভুলকে ভুল দিয়ে ঢাকা মহা-ভুল। তার অভিপ্রায় কি বিকৃত ? তার বিচার কি অন্যায় ?

তার চেতনা কি বাহ্যজ্ঞানশূন্য! এসব হিসেব করুক জন্মান্তরবাদ। তবে একথা তো সত্য যে তিনি জটাধারী সন্ন্যাসী বা নামকরা তান্ত্রিক নন। কে দেবে তাকে আহার, আশ্রয় আর আরাম। তার মত এক আনাড়ি গুরুর কোন শিষ্য জুটবে কি? তার কি এমন কোনো ক্ষমতা আছে যার বলে মানুষকে বশ করে শোনাবে মানব জীবনের ব্যাখ্যা, বেঁচে থাকার আসল পথের নিশানা।--ঘরের বাইরে কে চেনে তাকে?

তিনি ফিরে এলেন—বার করে নিলেন সঞ্চিত অর্থের সব কটা প্যাকেট। একটা গামছায় জড়ালেন লম্বা করে। গামছাটা বাঁধলেন কোমরে। বাবাঃ! কোমরটা বেশ মোটা আর ভার হলো। এবার পরলেন গেঞ্জি, জামা, দামী শালখানা নিখুঁত করে গায়ে দিলেন। আরো একটা ব্যাগে ভরলেন—ধুতি, জামা, পাজামা, লুঙ্গী। খুব তাড়াতাড়ি নিলেন দাঁত মাজার ব্রাশ, পেষ্ট, চিরুণী, জিভছোলা। কোনো মতে জুতো জোড়াটা গলিয়ে বেরিয়ে গেলেন শিশির মাখা ধরিত্রীর বুকে।—(ঘড়িতে তখন চারটে পনেরো।)

দশ পা হেঁটে তিনি আবার ফিরলেন। সমাপ্তি রেখাটুকু টানতে ভুলে গেছেন তিনি। লাফিয়ে গিয়ে ঢুকলেন বেয়ানদের ঘরে। আবার ভালো করে দেখলেন একজনকে। বই রাখা র‍্যাক্‌টা থেকে টেনে বার করলেন একটা লম্বা সাদা কাগজ। খুঁজে নিলেন একজনের সদ্য ব্যবহার করা আলতার শিশিটা। বড় অক্ষরে আলতা দিয়ে লিখলেন—আমার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নয়। অতএব পুলিশে খবর দিবেন না। লেখা কাগজটা নিজের শোবার খাটে রাখলেন সযতনে। আর দেরী নয়। এবার শুরু হবে নিরুদ্দেশ যাত্রা।

শেষ কাজটুকু শেষ করলেন শেষ কালে। টেনে নিলেন একটা লেবেল বিহীন ছোট শিশি। এক ফোঁটা আলতা, দু-ফোঁটা ফিনাইল এবং এক চিমটে বাসন মাজার ছাই পুরলেন ঐ শিশিতে। এবার ঢাললেন চার ফোঁটা জল। অনেকবার ঝাঁকিয়ে ঘরে ঢুকলেন। শিশিটা কাত করে রাখলেন লেখা কাগজটার ওপর। তারপর ঝড়ের বেগে বেরিয়ে পড়লেন গৃহত্যাগী হয়ে।

এই সংসার ইউনিভারসিটির পাঠ শেষ হয়েছে তার। পাঠ পড়িয়েছে তারই গুণধর নাতি-নাতনীরা। বাপমায়ের কোলজোড়া হয়ে সব বেঁচে থাকুক। সাইকেলে চেপে কাশ্মীর ঘুরুক, মোটর সাইকেলে করে ফবেণ যাক্ —তিনি যাবেন এই পৃথিবীর কোনো এক দূর প্রান্তে। সেখানে না-ই-বা রইলো নিজের কেউ। তিনি বড় ক্লান্ত। একটু বিশ্রামের বড় প্রয়োজন।

অনেক দিন পরে আজ তিনি স্বাধীন, মুক্ত আর চিন্তাশূন্য। মনটা সত্যিই আজ আনন্দে বিভোর। খুসীতে ডগমগ্।

— - -